POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

## আল্লাহ্‌র বাণী

قَالَ هٰذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّيْ ۚ
فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّيْ جَعَلَهٗ دَكَّآءَ ۚ
وَكَانَ وَعْدُ رَبِّيْ حَقًّا

সে বলিল,‘ ইহা আমার প্রতিপালকের তরফ হইতে বিশেষ অনুগ্রহ। অতঃপর, যখন আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়ার সময় আসিবে তখন তিনি উহাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিবেন। এবং আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি নিশ্চয় সত্য।

(সূরা কাহফ:৯৯)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 8

# বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 50

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 14 Dec, 2023 29 জামাদিউল আওয়াল 1445 A.H

## আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা’লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

## রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

২৪৭৬) হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (সা.) বলেছেন: সেই সময় আসবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না ইবনে মরিয়ম তোমাদের মধ্যে ন্যায়-বিচারক ও মীমাংসাকারী হিসেবে আবির্ভূত হন। তিনি ক্রুশ ভঙ্গ করবেন, শূকর বধ করবেন এবং জিজিয়া মুকুব করবেন। এবং তিনি অত্যধিক হারে সম্পদ বন্টন করবেন, কিন্তু সেই সম্পদ কেউ গ্রহণ করবে না।

(ব্যাখ্যা):হযরত সৈয়্যদ জয়নুল আবেদীন ওলীউল্লাহ্ শাহ সাহেব (রা.) বলেন: এই হাদীসটি এক মহান ভবিষ্যদ্বাণী সংবলিত। এর থেকে ক্রুশ ভঙ্গ করার এবং শূকর বধ করার বৈধতা প্রমাণিত হয় না।

২৪৭৭) সালমা বিন আকু (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (সা.) খয়বরের যুদ্ধে আগুন দেখতে পান যা প্রজ্জ্বলিত করা হচ্ছিল। তিনি (সা.) জিজ্ঞাসা করেন আগুন কেন জ্বালানো হয়েছে? লোকেরা উত্তর দেয়, পোষ্য গাধার মাংস রান্না হচ্ছে। আঁ হযরত (সা.) বললেন: (হাঁড়িগুলি) ভেঙে দাও এবং (যা কিছু এর মধ্যে আছে) সেগুলি উল্টে দাও। লোকেরা বলল: আমরা কি সেগুলি উল্টে ফেলে ধুয়ে ফেলতে পারি না? তিনি (সা.) উত্তর দিলেন: ধুয়ে নাও।

(সহী বুখারী, কিতাবুল মাযালিম)

### এই সংখ্যায়

**খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ১০ নভেম্বর ২০২৩**
**হুযুর আনোয়ার (আই.) এর অনলাইন সাক্ষাত**
**জলসা সালানায় প্রদত্ত ভাষণ**

**রসুলুল্লাহ্ (সা.)এর আশিসমণ্ডিত যুগের প্রতি দৃষ্টি দিলে দেখতে পাই যে, কিভাবে ইসলামের জীবনের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করা হত।**
**আমি আশ্চর্য হই যে, কেন মুসলমানরা ইসলামের সেবায় তথা খোদা তা’লার পথে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে না?**
**স্মরণ রেখো! এটা লোকসানের ব্যবসা নয়, বরং এতে রয়েছে অভাবনীয় লাভ।যদি মুসলমানেরা এই সত্য উপলব্ধি করত আর এই ব্যবসার লাভ সম্পর্কে অবগত হতে পারত!**

# হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

## খোদা তা’লার পথে নিজের জীবন উৎসর্গ করুন

খোদা তা’লার পথে নিজের জীবন উৎসর্গ করা মানুষের জন্য জরুরী। আমি কয়েকটি পত্রিকায় পড়েছি যে, অমুক আর্য তার জীবন আর্যসমাজের জন্য উৎসর্গ করেছে কিম্বা অমুক পাদ্রী মিশনের নামে তার জীবন উৎসর্গ করেছে। আমি আশ্চর্য হই যে, কেন মুসলমানরা ইসলামের সেবায় তথা খোদা তা’লার পথে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে না? রসুলুল্লাহ্ (সা.)এর আশিসমণ্ডিত যুগের প্রতি দৃষ্টি দিলে দেখতে পাই যে, কিভাবে ইসলামের জীবনের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করা হত।

স্মরণ রেখো! এটা লোকসানের ব্যবসা নয়, বরং এতে রয়েছে অভাবনীয় লাভ। যদি মুসলমানেরা এই সত্য উপলব্ধি করত আর এই ব্যবসার লাভ সম্পর্কে অবগত হতে পারত! যে ব্যক্তি খোদার জন্য তাঁর ধর্মের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করে, সে কি তার জীবন হারিয়ে ফেলে? কখনই নয়। فَلَهٗۤ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ আল্লাহ্‌র পথে এই উৎসর্গীকরণের প্রতিদান স্বয়ং প্রভু প্রতিপালক দিয়ে থাকেন। এই উৎসর্গীকরণ যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি দান করে।

প্রত্যেক মানুষ স্বভাবজাতভাবে সুখ-স্বাচ্ছন্দের বাসনা রাখে এবং দুঃখ-কষ্ট ও বেদনা থেকে মুক্তি পেতে চায়। তবে তারা কি কারণে যে এই ব্যাধির এক পরিক্ষিত উপাচারের প্রতি মনোযোগ দেয় না তা আমাকে আশ্চর্যই করে। আল্লাহ্‌র পথে উৎসর্গীকরণের এই পরিক্ষিত ব্যবস্থাপত্র কি বিগত ১৩০০ বছর থেকে প্রমাণিত আসছে না? সম্মানীয় সাহাবাগণ এই উৎসর্গীকরণের কারণেই কি এক পবিত্র ও শ্বাশত জীবনের অধিকারী হন নি? তবে কি কারণে এই ব্যবস্থাপত্রের পরিণাম থেকে লাভবান হওয়া থেকে এমন দ্বিধা করা হচ্ছে?

বস্তুত, মানুষ এই সত্য ও সুখানুভব সম্পর্কে অনভিজ্ঞ যা সেই উৎসর্গীকরণের পর লাভ হয়। তারা কেবল অনভিজ্ঞ, অন্যথায় সেই সুখ ও আনন্দ থেকে এক বিন্দু পরিমাণ তারা লাভ করত, তবে অশেষ আকাঙ্খা নিয়ে তারাও এই ময়দানে উপস্থিত হত।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫০০)

**মেডিস এবং পারস্যের সম্রাটদের মধ্য থেকেই কোন একজনকে জুলকারনাঈন হিসেবে বোঝানো হয়েছে। এই বাদশাহর মধ্যে কুরআন করীমে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যবলী বিদ্যমান এবং ইসুয়া নবীর বাণী থেকেও এ বিষয়টি সমর্থনপ্রাপ্ত।**

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ সূরা কাহফ এর ৮৪নং আয়াত وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ- এর ব্যাখ্যায় বলেন:

খোরস তথা সাইরাস বাদশাহর মহানুভবতার ইতিহাসের সমস্ত গ্রন্থেই পাওয়া যায়। তার সম্পর্কে লেখা আছে যে, শত্রুরাও তাকে ভালবাসত, এমনকি যখন সে কোন দেশের উপর আক্রমণ করত তখন তার পুণ্য ও ন্যায়পরায়ণতার কারণে শহরবাসী ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে সাক্ষাত করত এবং নিজেদের বাদশাহকে ত্যাগ করত। ইয়াসিয়া নবীও নিজের ইলহামে এ সম্পর্কে লিখেছেন যা এইরূপ- ‘খোরস এর স্বপক্ষে বলছি, সে আমার রাখাল, সে আমার সকল ইচ্ছা পূর্ণ করবে।” (অধ্যায়-২৪,২৮) তার পুণ্য এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট সম্পর্কে ইতিহাসবিদগণ যে মতামত প্রকাশ করেছেন তা এইরূপ: প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ডেনোফিন লেখেন- ‘আমি একবার মানব-প্রকৃতি সম্পর্কে অভিনিবেশ করি এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, মানুষের জন্য নিজের প্রকৃতি অনুসারে অন্যান্য জীবজন্তুদের উপর প্রভুত্ব করা সহজ। কিন্তু মানুষের উপর প্রভুত্ব করা কঠিন। কেননা, আমি চিন্তা করে দেখেছি, অনেক মানুষ আছে যাদের বাড়িতে কম-বেশি কয়েকজন ভৃত্য বা পরিচারক কাজ করে। কিন্তু তারা নিজেদের ভৃত্যদেরকেও নিজেদের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য করাতে পারে না। এর থেকে আমার মনে ধারণা তৈরী হয়েছে যে, এমন একজন মানুষও নেই যে কি না মানুষের উপর প্রভুত্ব করতে পারে, পক্ষান্তরে অন্যান্য জীবজন্তুর উপর প্রভুত্বকারী অনেক আছে। একথা ভাবতে ভাবতে আমার খোরস বাদশাহর কথা মনে পড়ে গেল, যে আমার মতামত পাল্টাতে বাধ্য করল। আমি বললাম, মানুষের উপর প্রভুত্ব করা কঠিন নয়। আমি দেখেছি, কিছু এমন মানুষ ছিল যারা সানন্দে সাইরাসের দাসত্ব বরণ করেছে, অথচ তাদের মধ্যে অনেকে দুই মাস দূরত্বে কেউ আবার চার মাস দূরত্বে অবস্থান করত। অনেকে এমনও ছিল

এরপর ৯ পাতায়....

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

**আপনার জন্মের আগে আপনার পিতা-মাতা ইসলামের সেবায় আপনার জীবন উৎসর্গ করেন এবং যখন আপনি ১৫ বছর বয়সে উপনীত হন, তখন আপনি ওয়াক্‌ফে নও-এর অঙ্গীকার নবায়ন করেন। যদি আপনি এটি মাথায় রাখেন, তাহলে আপনি অনুধাবন করতে পারবেন যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সেবায় আপনি একজন জীবন উৎসর্গকারী, আর একজন ওয়াক্‌ফে নও-এর প্রথমত কর্তব্য হচ্ছে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র আদেশ মান্য করা, অনুসরণ এবং অনুশীলন করা...।**

**"পৃথিবীতে অনেক অসুখ-বিসুখ আসে। উদাহরণস্বরূপ, বিভিন্ন সময়ে টাইফয়েডের প্রাদুর্ভাব অথবা ফ্লু (সর্দি-কাশি) বা অন্য কোনো অসুখেরও প্রাদুর্ভাব ঘটে থাকে। কখনও কখনও এসব রোগ-ব্যাধির মধ্যে যেগুলো বিস্তার লাভ করে বৈশ্বিক মহামারীতে পরিণত হয়, সেগুলোকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ মানবজাতিকে একথা স্মরণ করানোর জন্য প্রেরণ করেন যে, এক খোদা আছেন এবং তারা যেন তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তন করে এবং তাদের কৃত পাপরাশির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং অসুস্থতা থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে।"**

**প্রত্যেক রোগীর প্রতিই বিশেষ মনোযোগের সাথে অত্যন্ত দয়ার্দ্র আচরণ করুন। যদি আপনি এরূপ করেন, তাহলে তার প্রতি আপনার উত্তম আচরণের দ্বারাই রোগীর অসুস্থতার অনেকটা উন্নতি সাধন করবে এবং বাকি অসুস্থতা ঔষধ দ্বারা নিরাময় হবে। যদি আপনি দোয়া করেন এবং ঔষধ প্রদান করেন, তাহলে আপনার নিকট যে-সব রোগী আসেন তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক রোগীর চিকিৎসা করানোর তৌফিক প্রদান করবেন।**

## বাংলাদেশের ওয়াক্‌ফে নও পুরুষ সদস্যের সঙ্গে এক ভার্চুয়াল (অনলাইন) সভা করেন খলীফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আই.)

৩০ জানুয়ারি ২০২১ বাংলাদেশের ওয়াক্‌ফে নও স্কিমের ১৩৫ জনেরও বেশি পুরুষ সদস্যের সঙ্গে এক ভার্চুয়াল (অনলাইন) সভা করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)।

হুযূর আকদাস টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে তাঁর কার্যালয় থেকে এ সভার সভাপতিত্ব করেন, আর ওয়াক্‌ফে নও সদস্যগণ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের জাতীয় কার্যালয়, ঢাকার দারুত তবলীগ মসজিদ কমপ্লেক্স থেকে যোগদান করেন।

পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এর পরে একটি নযম এবং মহানবী (সা.)-এর হাদীস ও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর লেখনী থেকে পাঠ করা হয়। এক ঘণ্টার এই সভার বাকি সময়ে, ওয়াক্‌ফে নও স্কিমের সদস্যরা তাদের ধর্মবিশ্বাস, জীবন উৎসর্গকরণ এবং সমসাময়িক বিষয়াদি নিয়ে হুযূর আকদাসের নিকট বেশ কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করার সুযোগ লাভ করেন।

ইসলামের সেবায় একজন ওয়াক্‌ফে নও কীভাবে তার জীবন উৎসর্গ করার অঙ্গীকারকে উত্তমরূপে পূরণ করবেন- সে বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন: "আপনার জন্মের আগে আপনার পিতা-মাতা ইসলামের সেবায় আপনার জীবন উৎসর্গ করেন এবং যখন আপনি ১৫ বছর বয়সে উপনীত হন, তখন আপনি ওয়াক্‌ফে নও-এর অঙ্গীকার নবায়ন করেন। যদি আপনি এটি মাথায় রাখেন, তাহলে আপনি অনুধাবন করতে পারবেন যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সেবায় আপনি একজন জীবন উৎসর্গকারী, আর একজন ওয়াক্‌ফে নও-এর প্রথমত কর্তব্য হচ্ছে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র আদেশ মান্য করা, অনুসরণ এবং অনুশীলন করা...। আপনি শুধুমাত্র তখনই ওয়াক্‌ফে নও-এর চেতনা অক্ষুণ্ন রাখতে পারবেন যখন আপনি উপলব্ধি করবেন যে, পবিত্র কুরআনে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত সকল আদেশ-নিষেধ আপনাকে পালন করতে হবে।"

হুযূর আনোয়ার (আই.) আরও বলেন: "আপনাকে অবশ্যই দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করতে হবে এবং ছেলেদের জন্য সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি হলো, দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামা'তে আদায় করা। সে-সব নামাযে আল্লাহ্ তা'লার কাছে উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে দোয়া করুন যেন তিনি আপনাদেরকে সকল মন্দ কাজ থেকে রক্ষা করেন এবং আপনাকে ওয়াক্‌ফে নও হিসেবে আপনার দায়িত্বাবলী এবং আল্লাহ্ তা'লার সকল আদেশ পালনে সক্ষম করেন।

দ্বিতীয়ত, আপনি প্রতিদিন পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করবেন এবং শুধুমাত্র আরবী ভাষায় এটি তেলাওয়াত করবেন না, বরং এর পাশাপাশি এর অর্থও হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করবেন।"

এ ছাড়াও হুযূর আকদাস ব্যাখ্যা করেন যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের খেলাফতের সাথে একটি দৃঢ় ও শক্তিশালী সম্পর্ক বজায় রাখাও অপরিহার্য।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন: "সর্বদা খেলাফতের সাথে আপনার বন্ধনকে দৃঢ় ও শক্তিশালী করার চেষ্টা করুন এবং এটি কেবল তখনই সম্ভব যখন আপনি যুগখলীফার সমস্ত ভাষণ, বক্তৃতা এবং নির্দেশনা শুনবেন। এভাবেই আপনি আপনার ধর্ম-বিশ্বাসকে শক্তিশালী করে একজন উত্তম ওয়াক্‌ফে নও-এ পরিণত হতে পারবেন।"

সভায় উপস্থিত একজন কম-বয়সী ওয়াক্‌ফে নও জিজ্ঞাসা করেন যে, আল্লাহ্ কেন করোনা ভাইরাস পাঠিয়েছেন।

এর উত্তরে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন: "পৃথিবীতে অনেক অসুখ-বিসুখ আসে। উদাহরণস্বরূপ, বিভিন্ন সময়ে টাইফয়েডের প্রাদুর্ভাব অথবা ফ্লু (সর্দি-কাশি) বা অন্য কোনো অসুখেরও প্রাদুর্ভাব ঘটে থাকে। কখনও কখনও এসব রোগ-ব্যাধির মধ্যে যেগুলো বিস্তার লাভ করে বৈশ্বিক মহামারীতে পরিণত হয়, সেগুলোকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ মানবজাতিকে একথা স্মরণ করানোর জন্য প্রেরণ করেন যে, এক খোদা আছেন এবং তারা যেন তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তন করে এবং তাদের কৃত পাপরাশির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং অসুস্থতা থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে।"

অংশগ্রহণকারীদের একজন উল্লেখ করেন যে, হুযূর আকদাস তাকে লাইবেরিয়ায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত দ্বারা পরিচালিত একটি হাসপাতালে ডাক্তার হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। তিনি হুযূর আকদাসের নিকট দোয়া এবং দিক-নির্দেশনার জন্য আবেদন জানান।

এতে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: "আপনার প্রতি আমার দিক-নির্দেশনা এই যে, আপনার উচিত আফ্রিকার জনগণকে সত্যিকারের আন্তরিকতা এবং সেবার চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে সেবা করা। আফ্রিকার জনগণ এ রকম যে, যদি তাদের সাথে উত্তম আচরণ করা হয় আর তাদের দেখাশোনা করা হয়, তাহলে তারা আপনার প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ হবে এবং তারা আনন্দিত হবে যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত তাদের সেবা করছে। আপনি যদি উত্তম আচরণ এবং উত্তম নমুনা প্রদর্শন না করেন, তাহলে একজন জীবন-উৎসর্গকারী ডাক্তার হিসেবে যথাযথভাবে সেবা করার পরিবর্তে, আপনি আমাদের জামা'তের বদনামের কারণ হবেন। সর্বদা মনে রাখবেন, আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে মানুষের সেবার উদ্দেশ্যে আপনি সেখানে যাচ্ছেন। তাই মানুষের সেবা করেই আপনাকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে।"

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ কর্তৃক নির্মাণাধীন একটি চিকিৎসা-কেন্দ্রে জীবন উৎসর্গকারী হিসেবে কাজের জন্য নিযুক্ত আরেকজন ডাক্তারও দোয়া এবং দিকনির্দেশনা চান। হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আপনাকে অবশ্যই কঠোর পরিশ্রম এবং দোয়া করতে হবে। একজন ডাক্তারের সবসময় মনে রাখা উচিত যে, একমাত্র আল্লাহ্ তা'লাই একজন রোগীকে আরোগ্য দান করে থাকেন। তাই, এ কারণে, যখনই আপনি কোনো রোগী দেখেন, তাকে দেখার আগে দোয়া করুন এবং যখন আপনি প্রেসক্রিপশন (ব্যবস্থাপত্র) লিখেন, তখন এর উপরে 'হুয়াশ্-শাফী' [তিনিই আরোগ্যদাতা] লিখুন ... আর, যে-সকল রোগীকে আপনি দেখেছেন, রাতে নামাযে [তাহাজ্জুদে] তাদের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করুন, যেন আল্লাহ্ তাদেরকে সুস্বাস্থ্য দান করেন এবং আপনার হাতে তাদের আরোগ্য (শিফা) দান করেন।"

হুযূর আনোয়ার (আই.) আরও বলেন: "প্রত্যেক রোগীর প্রতিই বিশেষ মনোযোগের সাথে অত্যন্ত দয়ার্দ্র আচরণ করুন। যদি আপনি এরূপ করেন, তাহলে তার প্রতি আপনার উত্তম আচরণের দ্বারাই রোগীর অসুস্থতার অনেকটা উন্নতি সাধন করবে এবং বাকি অসুস্থতা ঔষধ দ্বারা নিরাময় হবে। যদি আপনি দোয়া করেন এবং ঔষধ প্রদান করেন, তাহলে আপনার নিকট যে-সব রোগী আসেন তাদের

এরপর ৯ পাতায়.....

# জুমআর খুতবা

**তোমরা মোটেই নেকী বা পুণ্য অর্জন করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা সেসব বস্তু হতে ব্যয় করো যেগুলো তোমরা ভালোবাসো।**

**এক জগৎপূজারীর দৃষ্টিতে এটি এমন এক বিষয় যা বোঝা খুবই কঠিন। কিন্তু যাদের ঈমান দৃঢ় তারা জানে যে, এসব কুরবানী এজন্য করা হয় কেননা এর ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ লাভ হয়।**

**ধনী ব্যক্তিদেরও বলব যে, তারাও যেন এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং নিজেদের কুরবানীর মানকে উন্নত করে। স্মরণ রাখবেন, আল্লাহ্ তা'লা কখনও কারো ঋণ রাখেন না।**

**আল্লাহ্ তা'লার প্রজ্জ্বলনকৃত বাতি বিরোধীদের ফুৎকারে কীভাবে নির্বাপিত হতে পারে! যতই চেষ্টা করুক না কেন বিরোধীদের কপালে অসফলতা ও ব্যর্থতাই লেখা আছে আর জামা'ত পৃথিবীর প্রত্যেক প্রান্ত থেকে কুরবানীর দৃষ্টান্ত স্থাপন করে উন্নতি করে চলেছে।**

**তাহরীকে জাদীদের উদ্দেশ্যই ছিল তবলীগের মাধ্যমে যেন জামা'ত বৃদ্ধি করা হয় আর পৃথিবীর সকল দেশে আহমদীয়াতেরমাধ্যমে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করা হয়। সুতরাং এরা আহমদীয়া জামা'তের মাধ্যমে প্রকৃত ইসলামের ছায়াতলে এসেছে যারা ঈমান, বিশ্বাস এবং কুরবানীর উন্নত দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করার চেষ্টা করে যাচ্ছে।**

**হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) প্রারম্ভে এই তাহরীককে দশ বছরের জন্য বৃদ্ধি করেছিলেন। তিন বছর থেকে দশ বছরে বৃদ্ধি করেছিলেন। এরপর দশ বছর পূর্ণ হবার পর এর উত্তম ফলাফল প্রকাশিত হলে এবং এর চাইতেও অধিক ত্যাগ স্বীকারকারীদের ইচ্ছানুযায়ী এটির সময়কালকে আরও বৃদ্ধি করে দেন এবং এরপর এটি একটি স্থায়ী তাহরীকের রূপ নেয়।**

**আজ পুনরায় উনিশ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর আমি ষষ্ঠ রেজিস্টারের ঘোষণা প্রদান করছি। এখন নতুন অংশগ্রহণকারী নও-মুবাঈন আর নতুন জন্মগ্রহণকারী শিশুরাও যারা পূর্বের কোনো রেজিস্টারে নেই– ষষ্ঠ রেজিস্টারের অন্তর্ভুক্ত হবে।**

**আল্লাহ্ তা'লা এসব কুরবানীকারীদের ধন-সম্পদ ও সংখ্যায় সমৃদ্ধি দান করুন এবং তারা পূর্বের চেয়ে অধিক কুরবানীকারী হোক।**

**ফিলিস্তিনিদেরকে দোয়াতে সর্বদা স্মরণ রাখুন, তাদেরকে ভুলে যাবেন না। নারী ও শিশুরা যে অত্যাচারের যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছে আল্লাহ্ তাদের দ্রুত মুক্তির ব্যবস্থা করুন।**

**তাহরীকে জাদীদের ৮৯তম বছরে জামাত আহমদীয়ার পক্ষ থেকে পেশকৃত আর্থিক কুরবানীর বিবরণ এবং ৯০তম বছরের ঘোষণা**

**সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক** লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে **মুবারকে প্রদত্ত** ৩ নভেম্বর, , ২০২৩, **এর জুমুআর খুতবা (৩ নবুয়ত ১৪০২ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,মহানবী (সা.)-এর সীরাত বা জীবনীর প্রেক্ষাপটে আমি বদরের সন্নিকটবতী ঘটনাবলীর উল্লেখ করছিলাম। এই বরাতে দ্বিতীয় হিজরী সনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর মাঝে একটি হলো মদিনার কবরস্থান জান্নাতুল বাকী-র প্রতিষ্ঠা। জান্নাতুল বাকী-র ভিত্তি এবং সূচনা সম্পর্কে যে বর্ণনা পাওয়া গেছে তা এরূপ যে, মহানবী (সা.)-এর মদিনায় আগমনের পর সেখানে বহু কবরস্থান ছিল। ইহুদিদের নিজস্ব কবরস্থান ছিল। অপরদিকে আরবের বিভিন্ন গোত্রের নিজ নিজ কবরস্থান ছিল। মদিনা তৈয়্যবা যেহেতু তখন বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত ছিল তাই প্রত্যেক গোত্র নিজ অঞ্চলে খোলা স্থানে তাদের মৃত ব্যক্তিদের দাফন করত। কু বাগোত্রের পৃথক কবরস্থান ছিল, যা অধিক প্রসিদ্ধ ছিল। যদিও সেখানে ছোট ছোট আরও কিছু কবরস্থানও ছিল। বনু জাফর গোত্রের নিজস্ব কবরস্থান ছিল। বনু সালামা গোত্রের নিজেদের পৃথক কবরস্থান ছিল। অন্যান্য কবস্থানের মাঝে বনু সায়েদা গোত্রের কবরস্থান ছিল, যার স্থলে পরবতীতে 'সূকুন্ নবী' [অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর বাজার] প্রতিষ্ঠিত হয়। যে স্থানে মসজিদে নববী নির্মিত হয় সেখানেও কিছু খেজুরগাছের মাঝে কতিপয় মুশরিকের কবর ছিল। এই সমস্ত কবরস্থানের মাঝে 'বাকীউল গারকাদ' সবচেয়ে পুরোনো ও প্রসিদ্ধ কবরস্থান ছিল। আর এরপর যখন মহানবী (সা.) এটিকে মুসলমানদের কবরস্থান হিসেবে নির্ধারণ করেন তখন থেকে আজ পর্য ন্ত এটির এক অনন্য ও বিশেষ মর্যাদা রয়েছে, যা সর্বদা থাকবে।

হযরত উবায়দুল্লাহ্ বিন আবি রাফে হতে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) এমন কোনো স্থানের সন্ধানে ছিলেন যেখানে কেবল মুসলমানদের কবর থাকবে আর এ উদ্দেশ্যে মহানবী (সা.) বিভিন্ন স্থান পরিদর্শনও করেন, অর্থাৎ সেসব স্থানে গিয়ে দেখেন। কিন্তু এই সম্মান 'বাকীউল গারকাদ'-এর ভাগ্যেই লেখা ছিল। মহানবী (সা.) বলেন, আমি আদেশপ্র াপ্ত হয়েছি যেন আমি এই স্থানকে অর্থাৎ 'বাকীউল গারকাদ'-কে [উক্ত উদ্দেশ্যে] নির্ধারণ করি। এটিকে সেই যুগে 'বাকীউল খাবখাবা'-ও বলা হতো। এতে অসংখ্য গারকাদ বৃক্ষ ও ঝোপঝাড় ছিল। মশা এবং অন্যান্য কীটপতঙ্গো জায়গাটি পূর্ণ ছিল। আর এই স্থানে নোংরার কারণে বা জঙলার কারণে যখন মশা উড়তো তখন মনে হতো যেন ধোঁয়ার মেঘ ছেয়ে গেছে। সেখানে সবার আগে যাকে দাফন করা হয়েছে তিনি ছিলেন হযরত উসমান বিন মাযউন।

মহানবী (সা.) তার কবরের মাথার দিকে একটি পাথর চিহ্নস্বরূপ রেখে দেন এবং বলেন, তিনি আমাদের অগ্রবর্তী। তার পর যখনই কারো মৃত্যু হতো তখন মানুষ মহানবী (সা.)-এর কাছে জিজ্ঞেস করত যে, তাকে কোথায় দাফন করা হবে। তখন তিনি (সা.) বলতেন, আমাদের অগ্রবর্তী উসমান বিন মাযউন এর পাশে বাকী-তে দাফন করো। আরবীতে বাকী এমন স্থানকে বলা হয় যেখানে গাছপালার আধিক্য থাকে, অর্থাৎ অনেক বেশি গাছপালা থাকে। যাহোক, মদিনা তাইয়্যেবায় এই স্থানটি বাকীউল গারকাদ নামে পরিচিতি লাভ করে, কেননা সেখানে গারকাদবৃক্ষের আধিক্য ছিল, যেমনটি আমি উল্লেখ করেছি। এছাড়া সেখানে অন্যান্য মরু ঝোপঝাড়ও অনেক বেশি ছিল। এটিকে জান্নাতুল বাকী-ও বলা হয়। আরবীতে জান্নাত শব্দের একটি অর্থ বাগান বা স্বর্গও হয়ে থাকে। তাই এই স্থানটি অধিকাংশ অনারব দর্শনার্থীর মাঝে জান্নাতুল বাকী নামে পরিচিত।

আব্দুল হামীদ কাদেরী সাহেব এই বর্ণনা লিখেছেন। এরপর তিনি বলেন যে, আমাদের একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, আরবরা সাধারণত তাদের সমাধিস্থল বা কবরস্থানগুলোকে জান্নাতই বলে থাকে। এর একটি নাম মাকাবেরুল বাকী-ও বটে, যা আরবদের মাঝে অধিক প্রসিদ্ধ।

(জুস্তজুয়ে মদীনা, প্রণেতা-আব্দুল হামীদ কাদরী, পৃ: ৫১৮)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এ সম্পর্কে সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে যা বর্ণনা করেছেন তা হলো, এ বছরেরই অর্থাৎ দ্বিতীয় হিজরী সনের শেষদিকে মহানবী (সা.) নিজ সাহাবীদের জন্য মদিনায় একটি কবরস্থানের প্রস্তাব করেন, যেটিকে জান্নাতুল বাকী বলা হয়। এরপর সাহাবীরা সাধারণত এই কবরস্থানেই সমাহিত হতেন। সর্বপ্রথম যিনি এই কবরস্থানে সমাহিত হয়েছিলেন তিনি ছিলেন হযরত উসমান বিন মাযউন। উসমান একেবারে প্রাথমিক মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। একান্ত পুণ্যবান ও ইবাদতকারী এবং সূফী প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। মুসলমান হওয়ার পর একবার তিনি মহানবী (সা.)-এর কাছে নিবেদন করেন যে, হুযূর! আমাকে অনুমতি দিলে আমি চাই সম্পূর্ণরূপ সংসারত্যাগী হয়ে এবং স্ত্রী-সন্তানদের কাছ থেকে পৃথক হয়ে নিজের জীবন পরিপূর্ণ রূপে খোদার ইবাদতের জন্য উৎসর্গ করব। কিন্তু তিনি (সা.) এর অনুমতি দেননি। বরং যারা সংসারত্যাগী না হলেও নামায রোযা এত বেশি পরিমাণে আদায় করত যে, এতে তাদের অধীনস্থদের অধিকার প্রভাবিত হতো- তাদের সম্পর্কেও তিনি (সা.) বলেছেন যে, তোমাদের উচিত খোদার অধিকার খোদাকে দান করা, স্ত্রী-সন্তানদের অধিকার তাদেরকে দেওয়া, অতিথির অধিকার তাকে দেয়া, আর নিজ আত্মার অধিকার নিজ আত্মাকে দেয়া, কেননা এই সমস্ত অধিকার খোদা তা'লা কর্তৃক নির্ধারিত হয়েছে। আর এগুলোর দায়িত্ব পালন করা ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ এসব অধিকার প্রদান করাও ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। মোটকথা তিনি (সা.) উসমান বিন মাযউনকে সংসারত্যাগী হওয়ার অনুমতি দেননি। আর ইসলাম ধর্মে কৌমার্যব্রত ও বৈরাগ্যকে অবৈধ আখ্যা দিয়ে স্বীয় উম্মতের জন্য বাড়াবাড়ির পরিবর্তে একটি মধ্যমপন্থা প্রতিষ্ঠা করেন। উসমান বিন মাযউন-এর মৃত্যুতে তিনি (সা.) অনেক কষ্ট পান। রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, [তার] মৃত্যুর পর তিনি (সা.) তার ললাটে চুম্বন করেন আর তখন তাঁর (সা.) চোখ অশ্রুসিক্ত ছিল। তাকে দাফন করার পর তিনি (সা.) তার কবরের মাথার দিকে একটি পাথর চিহ্ন হিসেবে রেখে দেন। এরপর তিনি (সা.) মাঝে মাঝে জান্নাতুল বাকীতে গিয়ে তার জন্য দোয়া করতেন। উসমান ছিলেন মদিনায় মৃত্যু বরণকারী প্রথম মুহাজের।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৪৬২-৪৬৩)

এখন আমি যী আমর এর যুদ্ধ বা বনু গাতফান এর যুদ্ধের উল্লেখ করছি। মহানবী (সা.)-এর কাছে এই সংবাদ আসে যে, গাতফান গোত্রের শাখা বনু সালেবা ও বানু মুহারেব যী আমর নামক স্থানে একত্রিত হয়েছে। এটি গাতফান অঞ্চলের একটি বসতি। তাদের উদ্দেশ্য হলো মদিনা রাজ্যের আশেপাশের অঞ্চলসমূহে আক্রমণ করা। তাদের সবাইকেসমবেতকারী আর মুসলমানদের বিরুদ্ধে উস্কানিদাতা ছিল বনু মুহারেব গোত্রের এক ব্যক্তি দোসুর বিন হারেস। এই সংবাদ পেতেই মহানবী (সা.) মানুষকে প্রস্তুতির নির্দেশ দেন আর সাড়ে চারশত সদস্যের বাহিনী নিয়ে মদিনা থেকে যাত্রা করেন। তাদের কাছে [তখন] কয়েকটি ঘোড়াও ছিল। আর মদিনায় মহানবী (সা.) হযরত উসমান বিন আফফানকে নিজের স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন।

(আসসীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৯০) (সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৭৬)

তৃতীয় হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাসে গাতফানের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ১২ রবিউল আউয়াল তারিখে তিনি (সা.) এই যুদ্ধের জন্য রওয়ানা হন। এগারো দিন মদিনাবাসীদের তাঁর (সা.) সাথে বিচ্ছেদ সহ্য করতে হয়েছে। এরপর তিনি (সা.) ২৪ রবিউল আউয়াল তারিখে মদিনায় ফিরে আসেন। মহানবী (সা.) গাতফানকে দমন করার জন্য তাদের নিকটবর্তী যে স্থানে শিবির স্থাপন করেন তার নাম ছিল যী আমর। এ কারণেই উক্ত যুদ্ধকে যী আমর এর যুদ্ধ আর গাতফান গোত্রের ভিত্তিতে এটিকে বনু গাতফানএর যুদ্ধও বলা হয়ে থাকে।

(আসসীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৯০) [দায়েরায়ে মারেফ, সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৩৬৭-৩৬৮]

মুশরিকদের দলগঠনের বিরুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর যাত্রা করার বিস্তারিত বর্ণনায় এভাবে লেখা আছে যে, মদিনা থেকে যাত্রা করার পর সাহাবীরা যুল কাস্সা নামক স্থানে বনু সালেবা-র এক ব্যক্তিকে পায়। যুল কাস্সা রাবাযা যাওয়ার পথে মদিনা থেকে ২৪ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। এই ব্যক্তির নাম ছিল জব্বার। সাহাবীরা তাকে বন্দি করেন আর তাকে জিজ্ঞেস করেন যে, কোথায় যাচ্ছো? সে উত্তরে বলে, মদিনা যেতে চাই আর নিজ জীবিকার সন্ধানে যাচ্ছি। তখন তাকে মহানবী (সা.)-এর কাছে নিয়ে আসা হয়।সে মহানবী (সা.)-কে স্বীয় জাতির অবস্থা সম্পর্কে অবগত করে। তিনি (সা.) তাকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানালে সে তৎক্ষণাৎ মুসলমান হয়ে যায়। সে যখন মহানবী (সা.)-এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত হয় যে, তিনি বনু সালেবা ও বনু মুহারেব এর ওপর আক্রমণ করতে বের হয়েছেন, তখন সে তাঁর (সা.) সমীপে নিবেদন করে যে, হে মুহাম্মদ (সা.)! তারা মোটেই আপনার মুখোমুখি হবে না। তারা যদি আপনার আগমন সম্পর্কে জানতে পারে তাহলে তারা পালিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় আশ্রয় নেবে। নিঃসন্দেহে তারা মদিনার আশেপাশে আক্রমণ করতে চাইছিল কিন্তু মুসলমানদের মুখোমুখি হবে না। সে আরও বলে যে, আমিও আপনাদের সাথে যেতে চাই। মহানবী (সা.) জব্বারকে বেলালের হাতে সোপর্দ করেন। সেই ব্যক্তি মুসলমানদের একটি ভিন্ন পথ দিয়ে নিয়ে যায় আর তাদের অঞ্চলে নিয়ে আসে। সেখানে উপস্থিত লোকেরা যখন মুসলিম বাহিনীকে আসতে দেখে তখন সবাই পালিয়ে যায় আর পাহাড়ে গিয়ে আশ্র য় নেয়। মহানবী (সা.) অগ্রসর হয়ে যী আমর নামক ঝরনায় পৌঁছেন। সেখানে শিবির স্থাপন করেন। হঠাৎ সেখানে ভারি বর্ষণ আরম্ভ হয় আর মহানবী (সা.) ও সাহাবীদের কাপড় ভিজে যায়। তিনি (সা.) নিজের ভেজা কাপড় শুকানোর জন্য গাছের সাথে ঝুলিয়ে রাখেন আর স্বয়ং সেই গাছের নীচে শুয়ে পড়েন। অন্যান্য সাহাবীরা তখন নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এখানে মহানবী (সা.)-কে শহীদ করার অপবিত্র চেষ্টাও করা হয়েছিল। এ সম্পর্কে তরবারি দ্বারা আক্রমণকারী এক ব্যক্তির ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। পাহাড়ের চূড়ায় আশ্রয় গ্রহণকারী লোকেরা পাহাড়ের ওপর থেকে মহানবী (সা.)-এর সমস্ত গতিবিধি লক্ষ্য করছিল। মুশরিকরা যখন মহানবী (সা.)-কে এক স্থানে একা শায়িত দেখে তখন তারা তাদের নেতা দোসুর-এর কাছে আসে। এই ব্যক্তি তাদের মাঝে সবচেয়ে বেশি সাহসী ছিল। মুশরিকরা তাকে বলে যে, এখন মুহাম্মদ (সা.) সম্পূর্ণ একা শুয়ে আছেন। এখন তোমার কাজ হলো তাঁর সাথে বোঝাপড়া করা। একটি রেওয়ায়েতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, স্বয়ং দোসুর যখন মহানবী (সা.)-কে সেখানে একা শায়িত দেখে তখন সে বলে, এখনও যদি আমি মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা না করি তাহলে আল্লাহ্ স্বয়ং আমাকে ধ্বংস করুন। যাহোক, একথা বলে দোসুর তরবারি হাতে অগ্রসর হয় আর একেবারে মহানবী (সা.)-এর মাথার কাছে গিয়ে থামে। এরপর হঠাৎ সে তাঁকে (সা.) সম্বোধন করে বলে যে, আজ অথবা একথা বলে যে, এখন আপনাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করতে পারে? মহানবী (সা.) একান্ত প্রশান্ত চিত্তে বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে তোমার হাত থেকে রক্ষা করবেন। এতে সে মাটিতে পতিত হয় আর তরবারি তার হাত থেকে পড়ে যায়। মহানবী (সা.) তৎক্ষণাৎ তার তরবারি উঠিয়ে নেন আর তাকে বলেন, এখন তোমাকে আমার হাত থেকে কে বাঁচাবে? এতে দোসুর বলে, ***'লা আহাদুন। ওয়া আনা আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান রাসূলুল্লাহ্। ওয়াল্লাহে লা উকাস্সেরু আলাইকা জামআন আবাদান।'*** অর্থাৎ, কেউ নয়। আমাকে এখন আর কেউ বাঁচাতে পারবে না। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ উপসনার যোগ্য নয় এবং মুহাম্মদ আল্লাহ্র রসূল। খোদার কসম, আগামীতে আমি কখনো আপনার বিরুদ্ধে মানুষকে একত্রিত করব না। সে এই অঙ্গীকার করে। তিনি (সা.) তার তরবারি তাকেই দান করে দেন। অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, দোসুর তাঁকে (সা.) সম্বোধন করে বলে, খোদার কসম, আপনি অনুগ্রহ করার ক্ষেত্রে আমার চেয়ে উত্তম। মহানবী (সা.) উত্তরে বলেন, *'আনা আহাক্কু বেযালিকা মিনকা।'* আমি অনুগ্রহ করার ক্ষেত্রে

তোমার চেয়ে অধিক অধিকার রাখি। এরপর দোসুর নিজ জাতির কাছে ফিরে যায়, কিন্তু তার অবস্থা সম্পূর্ণ পাল্টে গিয়েছিল আর সে নিজ জাতিকে তবলীগ করছিল। দোসুর বলে, অর্থাৎ সে বর্ণনা করে যে, আমার সাথে কী ঘটেছিল। কীভাবে আমি পড়ে যাই। পড়ে যাওয়ার ঘটনাটি সে এভাবে বর্ণনা করে যে, সেখানে আমি এক দীর্ঘকায় ব্যক্তিকে দেখি। যখন আমি সেখানে তরবারি হাতে দঁ াড়িয়ে ছিলাম তখন আমি দেখি যে, সেখানে অনেক দীর্ঘকায় এক ব্যক্তি আসে। সে আমার বুকে ধাক্কা দেয়। তখন আমি চিৎ হয়ে পড়ে যাই। অর্থাৎ সেই ব্যক্তি যখন হাত দিয়ে ধাক্কা দেয় তখন আমি চিৎ হয়ে পড়ে যাই। তখন আমি বুঝতে পারি, সে কোনো মানুষ নয়। এ তো কোনো ফেরেশতা। অতএব আমি তখনই স্বীকার করে নিই যে, আল্লাহ্ ছাড়া কেউ উপাসনার যোগ্য নয় আর মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্র রসূল। সে বলে যে, আল্লাহ্র কসম, আমি তাঁর (সা.) বিরুদ্ধে কখনো কোনো পদক্ষেপ নিব না। এরপর তিনি তার জাতির কাছে ইসলামের তবলীগ করতে থাকেন। আল্লাহ্ তা'লা তার মাধ্যমে বহু মানুষকে হেদায়েত দান করেন। যাহোক, এরপর মহানবী (সা.) মদিনায় ফিরে আসেন। আর কোথাও কোনো লড়াই হয়নি। এই যুদ্ধের জন্য তিনি (সা.) মোট এগারো দিন মদিনার বাহিরে ছিলেন। অপর এক মত অনুযায়ী পনেরো দিন মদিনার বাহিরে ছিলেন। আবু উমর বলেন, মহানবী (সা.) নাজাদ-এ সফর মাসের পুরোটাই অবস্থান করেন। যাহোক, এগুলো হলো বিভিন্ন রেওয়ায়েত, কিন্তু এটি মাত্র কয়েক দিনেরই সফর ছিল।

কতিপয় আলেম মহানবী (সা.)-এর ওপর তরবারি দ্বারা আক্রমণকারীর উপরোক্ত ঘটনা যা তাঁর (সা.) প্রাণনাশের চেষ্টা ছিল, সেটিকে যাতুর রিকা-র যুদ্ধের ঘটনা আখ্যা দিয়েছেন আর এটিকে একটিই ঘটনা হিসেবে গ্র হণ করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ গবেষক বলেছেন যে, এই উভয় ঘটনা দুটি পৃথক পৃথক যুদ্ধের ঘটনা। যাতুর রিকা-র যুদ্ধের সময় আক্রমণকারী ব্যক্তির নাম গওরেছ-ও বর্ণিত হয়েছে। আর তার সম্পর্কে এটিও বলা হয় যে, সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। আবার এই মতও রয়েছে যে, সে ইসলাম গ্রহণ করেনি। তথাপি সে মহানবী (সা.)-এর সাথে এই অঙ্গীকার করেছিল যে, আগামীতে কখনো তাঁর (সা.) বিরুদ্ধে দাঁড়াবে না। বুখারীর রেওয়ায়েতও এটিই।

(আসসীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৯০) (সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৭৬)(সীরাত এনসাইক্লোপেডিয়া, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৭১) (শারাহ যারকানি, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৮১-৩৮২) (সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, বাব-গাযওয়াতুর রিকা, হাদীস-৪১৩৬)

এই সময়ের ঘটনাবলীর মাঝে আরেকটি ঘটনা হলো, হযরত রুকাইয়্যা মৃত্যু বরণ করেন এবং হযরত উম্মে কুলসূম-এর বিয়ে হয়। এর বিস্তারিত বর্ণনা যা হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মুনকেফ বিন হারেসা আনসারী বর্ণনা করেছেন তা হলো, মহানবী (সা.) যখন বদরের যুদ্ধের জন্য রওয়ানা হন তখন হযরত উসমানকে নিজ কন্যা হযরত রুকাইয়্যার কাছে রেখে যান। তিনি অসুস্থ ছিলেন। আর তিনি সেই দিন মৃত্যু বরণ করেন যেদিন হযরত যায়েদ বিন হারেসা মদিনায় সেই বিজয়ের সুসংবাদ নিয়ে আসেন যা বদরের প্রান্তরে আল্লাহ্ তা'লা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে দান করেছিলেন। মহানবী (সা.) হযরত উসমানের জন্য বদরের যুদ্ধের গনিমতের সম্পদে অংশ নির্ধারণ করেন। আর তার অংশ বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের সমান ছিল। মহানবী (সা.) হযরত রুকাইয়্যার মৃত্যুর পর হযরত উসমান বিন আফ্ফানের সাথে নিজ কন্যা হযরত উম্মে কুলসূম-এর বিয়ে দেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, লি ইবনে সাআদ, ৩য় ভাগ, পৃ: ৪১)

হযরত আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত হয়েছে যে, মসজিদের দ্বারে হযরত উসমানের সাথে মহানবী (সা.)-এর সাক্ষাৎ হয়। তিনি (সা.) বলেন, উসমান! ইনি হলেন জিবরাঈল। তিনি আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, আল্লাহ্তা'লা রুকাইয়্যার ন্যায় মোহরানায় আর তার সাথে তোমার সদাচরণের ভিত্তিতে উম্মে কুলসূম-এর বিয়ে তোমার সাথে দিয়েছেন।

(সুনানে ইবনে মাজা, ইফতাহুল কিতাব, হাদীস-১১০)

অর্থাৎ রুকাইয়্যার জন্য যে মোহরানা ছিল সেই মোহরানাতেই তোমার সাথে বিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন যে, দ্বিতীয় কন্যার বিয়েও যেন হযরত উসমানের সাথে দেওয়া হয়।

হযরত আয়েশা বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) যখন উম্মে কুলসূম এর বিয়ে হযরত উসমানের সাথে দেন তখন তিনি হযরত উম্মে আয়মানকে বলেন, আমার কন্যা উম্মে কুলসূমকে প্রস্তুত করে উসমানের ঘরে দিয়ে এসো আর তার সামনে ঢাক বাজাও। অতএব তিনি তা-ই করেন।

মহানবী (সা.) তিন দিন পর হযরত উম্মে কুলসূম এর কাছে যান এবং বলেন, হে আমার প্রিয় কন্যা! তুমি তোমার স্বামীকে কেমন দেখলে? উম্মে কুলসূম নিবেদন করেন যে, তিনি সর্বোত্তম স্বামী।

(সীরাতুল মোমেনীন উসমান বিন আফফান শখসিয়াতুহু ওয়া আসরুহু, প্রণেতা- আলি মহম্মদ সালাবী, পৃ: ৪১)

হযরত উম্মে কুলসুম (রা.) হযরত উসমান (রা.)-এর কাছে নয় হিজরী পর্যন্ত ছিলেন, এরপর তিনি অসুস্থ হয়ে মৃত্যু বরণ করেন। মহানবী (সা.) তার জানাযার নামায পড়ান এবং তার কবরের পাশে গিয়ে বসেন। হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, তিনি মহানবী (সা.)-কে হযরত উম্মে কুলসূম (রা.)-এর কবরের পাশে অশ্রুসিক্ত নয়নে বসে থাকতে দেখেছেন।

(সীরাতুল মোমেনীন উসমান বিন আফফান শখসিয়াতুহু ওয়া আসরুহু, প্রণেতা- আলি মহম্মদ সালাবী, পৃ: ৪২)

বুখারীর রেওয়ায়েতে এই ঘটনার বর্ণনা এভাবে পাওয়া যায় যে,হেলাল (রাহে.) হযরত আনাস বিন মালেক (রা.)-এর বরাতে বর্ণনা করেন, আমরা মহানবী (সা.)-এর কন্যার জানাযায় উপস্থিত ছিলাম। তিনি (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) কবরের পাশে বসে ছিলেন, আমি দেখি তিনি (সা.) বসে বসে অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছেন।

(সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল জানায়েয, হাদীস-১৩৪২)

এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী মহানবী (সা.) হযরত উম্মে কুলসূমের মৃত্যুতে বলেন, আমার যদি তৃতীয় কোনো মেয়ে থাকতো তাহলে তাকেও উসমানের সাথে বিবাহ দিতাম।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড,পৃ: ৪১)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) এক জায়গা দিয়ে অতিক্রম করার সময় দেখন যে, হযরত উসমান (রা.) সেখানে বসে আছেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কন্যা হযরত উম্মে কুলসূম এর মৃত্যুশোকে কাঁদছেন। বর্ণনাকারী বলেন, মহানবী (সা.)-এর সাথে তাঁর উভয় সাথী অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.) ছিলেন। মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন, হে উসমান! তুমি কেনো কাঁদছো? হযরত উসমান (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমি কাঁদছি কারণ আপনার সাথে আমার জামাই-শশুর সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে। [আমার সাথে আপনার দু'কন্যা বিবাহ দিয়েছেন কিন্তু দু'জনেই মারা গেছে। এখন তো জামাই-শশুর সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে।] মহানবী (সা.) বলেন, কান্নাকাটি করো না, সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, আমার যদি একশ' জন মেয়েও থাকতো আর এক এক করে সবাই যদি মৃত্যু বরণ করতো তবুও একের পর এক প্রত্যেককে আমি তোমার সাথে বিবাহ দিতাম এমনকি একশ' জনের মাঝে কেউ বেঁচে না থাকলেও।

(কুনযুল উম্মাল, খণ্ড-১৩, পৃ: ২১, হাদীস-৩৬২০১)

যাহোক, এটি পারস্পরিক ভালোবাসা ও সম্পর্কের বহিঃপ্র কাশ ছিল। হযরত উসমান (রা.) এ বিষয়টি নিয়ে দুঃখ পাচ্ছিলেন যে, এখন তো জামাই-শশুরের সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু মহানবী (সা.) উন্নত পর্যায়ের মনস্তুষ্টি করতে গিয়ে সুনিশ্চিত করেন যে, এই সম্পর্ক তো প্রতিষ্ঠিত আছে, তুমি এটি নিয়ে অযথা দুশ্চিন্তা করো না।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে এই বিয়ের উল্লেখ এভাবে করেছেন যে,হযরত উসমান (রা.)-এর সহধর্মিণী রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কন্যা হযরত রুকাইয়্যা মৃত্যু বরণ করলে মহানবী (সা.) তাঁর দ্বিতীয় কন্যা উম্মে কুলসূ মকে হযরত উসমান (রা.)-এর সাথে বিবাহ দেন যিনি বয়সে হযরত ফাতেমা (রা.)-এর চেয়ে বড় কিন্তু রুকাইয়্যা (রা.)-এর চেয়ে ছোট ছিলেন। এ কারণেই হযরত উসমান (রা.)-কে যুন্নুরাইন তথা দুই নূর ওয়ালা বলা হয়। এটি উম্মে কুলসূ ম (রা.)-এর দ্বিতীয় বিবাহ ছিল, কেননা তিনি এবং তাঁর বোন রুকাইয়্যা (রা.) শুরুতে মহানবী (সা.)-এর চাচা আবু লাহাবের দুই পুত্রের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। কিন্তু তাদের রুখসাতানা হওয়ার পূর্বে ই ধর্মীয় মতপার্থক্যের কারণে এই বিবাহ ভেঙে যায়। মহানবী (সা.) প্রথমে হযরত উসমান (রা.)-এর সাথে রুকাইয়্যা (রা.)-এর বিবাহ দেন এবং রুকাইয়্যার মৃত্যুর পর উম্মে কুলসূ মকে বিবাহ দেন। কিন্তু পরিতাপ! এ উভয় সাহেবযাদীর বংশ অগ্রসর হয়নি, কেননা উম্মে কুলসূমের কোনো সন্তান হয়নি আর রুকাইয়্যা (রা.)-এর পুত্র আব্দুল্লাহ্ ছয় বছর বয়সে উপনীত হয়ে মৃত্যু বরণ করেন। উম্মে কুলসূ মের বিবাহ হয় তৃতীয় হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাসে।"

## মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

দোয়ার জন্য হৃদয় যখন বেদনায় পূর্ণ হয়ে যায় এবং সকল আবরণকে বিদীর্ণ করে ফেলে, সেই সময় বুঝে যাওয়া উচিত যে দোয়া কবুল হয়েছে। এটি মহান নাম। **(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০০)**

দোয়াপ্রার্থী: **Pervez Hossain Sb, Bolpur, Birbhum**

(সীরাত খাতামান্নাবীইন, পৃ: ৪৬৩-৪৬৪)

এসময়ের ঘটনাবলীর মাঝে বোহরানের যুদ্ধাভিযানেরও উল্লেখ রয়েছে। এটিকে বোহরানের যুদ্ধাভিযান ছাড়াও ফরুর যুদ্ধাভিযান এবং বনু সুলায়েম-এর যুদ্ধাভিযানও বলা হয়। বোহরান ফরু উপত্যকার পাশে হেজাযবাসীদের একটি খনিজসম্পদের খনি এবং ফরু উপত্যকা মদীনা থেকে ছিয়ানব্বই মাইল দূরে অবস্থিত।

মহানবী (সা.) সংবাদ পান যে, বনু সুলায়েম গোত্রের লোকজন বড় সংখ্যায় বোহরানে একত্রিত হয়েছে। তখন মহানবী (সা.) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উম্মে মাকতুম (রা.)-কে মদিনায় নিজ স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে, অন্য এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত উমর (রা.)-কে নিজ স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে তিনশত সাহাবীর সেনাদল নিয়ে বোহরানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, যদিও তিনি (সা.) তাঁর যাত্রার উদ্দেশ্য প্রকাশ করেননি। ইসলামী সেনাদল যখন বোহরান থেকে এক রাতের দূরত্বে গিয়ে উপনীত হয় তখন সেখানে বনু সুলায়েম গোত্রের এক ব্যক্তিকে পায়। সে মহানবী (সা.)-কে বলে যে, তারা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে গেছে। তখন মহানবী (সা.) সেই ব্যক্তিকে একজন সাহাবীর হাতে তুলে দেন অতঃপর সম্মুখে অগ্রসর হন এবং অবশেষে বোহরান গিয়ে পৌঁছেন। সেখানে তিনি (সা.) কাউকে পাননি, কেননা সবাই নিজ নিজ পানি সংগ্রহের স্থানে বিক্ষিপ্ত হয়ে চলে গিয়েছিল। অবশেষে তিনি (সা.) ফেরত চলে আসেন এবং যুদ্ধের কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি। মহানবী (সা.) উক্ত যুদ্ধাভিযানের জন্য ০৬ জমাদিউল উলা তারিখে মদিনা থেকে বের হন এবং ১০ রাত মদিনার বাইরে থাকার পর তিনি (সা.) ১৬ জমাদিউল উলা ফিরে আসেন। এর বিপরীতে ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) কুরাইশের বণিক দলকে বাধাগ্রস্ত করতে চাচ্ছিলেন, এই অভিপ্র ায়ে তিনি (সা.) বোহরান গিয়ে উপনীত হন যেটি হেজাযের ফরু উপত্যকার একটি খনি। অতএব তিনি (সা.) সেখানে রবিউল আখের এবং জমাদিউল উলার দুই মাস অবস্থান করেন, এরপর তিনি (সা.) মদিনায় ফিরে আসেন। এই সময়ের মাঝে কোনো যুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি। (শারাহ যারকানি আলা মোয়াহিবুললাদানিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ :৩৮২-৩৮৩) (ফারহাঙ্গে সীরাত, পৃ: ২২৬)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব বোহরান যুদ্ধাভিযানের বিস্তারিত এভাবে বর্ণনা করেন যে, তখনও যী আমর-এর যু দ্ধের বেশি দিন অতিক্রান্ত হয়নি, অর্থাৎ রবিউল আউয়ালের শেষ দিনগুলোতে তৃতীয় হিজরীতে মহানবী (সা.) এই ভয়ানক সংবাদ পান যে, বনু সুলায়েম গোত্র পুনরায় বোহরান উপত্যকায় মদিনার ওপর অতর্কিত আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে অনেক বড় সংখ্যায় একত্রিত হচ্ছে, এমনকি তাদের সাথে কুরাইশদের একটি দলও যুক্ত হয়েছে। অনন্যোপায় হয়ে মহানবী (সা.) পুনরায় সাহাবীদের একটি দলকে সাথে নিয়ে মদিনা থেকে যাত্রা করেন। কিন্তু স্বভাব অনুযায়ী আরবের এই বন্য হিংস্র পশুরা যারা নিজেদের শিকারের ওপর অতর্কিত এবং অপ্র স্তুত অবস্থায় আক্রমণ করার সু যোগ খুঁজছিল, তারা মহানবী (সা.)-এর আগমনের খবর শুনে দিগ্বিদিক ছুটে পালায় আর মহানবী (সা.) কিয়দকাল সেখানে অবস্থান করে মদিনায় ফিরে আসেন।

বনু সুলায়েম এবং বনু গাতফানের এভাবে বার বার মদিনার ওপর আক্রমণ করার অভিপ্রায়ে একত্রিত হওয়া সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করছে যে, আরব মরুভূমির এই হিংস্র এবং যুদ্ধবাজ গোত্রগুলো ইসলামের ঘোরতর শত্রু ছিল আর অহর্নিশি এই দুরভিসন্ধিতে থাকতো যে, কোনো একটি সুযোগ পেলে মুসলমানদেরকে ধ্বংস করে দেবে। মুসলমানদের সেই সময়ের স্পর্শকাতর অবস্থা অনুমান করে দেখুন যে, সে-যুগে তারা কীভাবে দিনাতিপাত করছিল। এক দিকে ছিল মক্কার কুরাইশরা যাদেরকে ইসলামের প্রতি শত্রুতা এবং বদর যুদ্ধের প্রতিশোধের চেতনা অন্ধ করে রেখেছিল আর তারা খানা কা'বার পর্দা শরীরে জড়িয়ে শপথ করেছিল যে, যতদিন মুসলমানদেরকে ধ্বংস না করবে ততদিন তারা বিশ্রাম নিবে না। অন্যদিকে ছিল আরব মরুভূমির এই রক্তপিপাসু পশুরা, যাদেরকে কুরাইশের উস্কানি এবং ইসলামের শত্রুতা মুসলমানদের রক্তপিপাসায় অস্থির করে রেখেছিল। অতএব দেখো, বদরের পর কয়েক মাসের মধ্যে মহানবী (সা.)-কে কতবার স্বয়ং ঐসকল হিংস্র আরব গোত্রগুলোর রক্তপাতমূলক অভিপ্রায় থেকে নিজেদের সুরক্ষিত রাখার জন্য সফর করতে হয়েছে।

## যুগ ইমামের বাণী

**ইসলামের সুরক্ষা এবং সত্যের উদ্ঘাটনের জন্য সর্বপ্রথম তোমরা প্রকৃত মুসলমানের নমুনা হয়ে দেখাও।**

**(মালফুযাত , ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৫)**

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

যেভাবে স্যার উইলিয়াম ম্যুইর সুস্পষ্ট করে বলেছেন যে, সেই দিনগুলো ছিল ভীষণ গরমের দিন আর সেই উত্তাপও ছিল আরবের মরুভূমির উত্তাপ।

যদি আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য না হতো এবং মহানবী (সা.)-এর বিচক্ষণতা মুসলমানদেরকে প্র তিনিয়ত সজাগ ও সতর্ক না রাখতো আর তিনি (সা.) শত্রুদলের আক্রমণের পূর্বেই তাদেরকে বিক্ষিপ্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ না করতেন তবে সেই দিনগুলোতে মুসলমানদের বিনাশ ও ধ্বংস হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ ছিল না। আর এগুলো কেবল বহিস্থ শঙ্কা ছিল। বাকি অভ্যন্ত রীণ ভয়-শঙ্কাও কোনো অংশে কম ছিল না। মদিনার অভ্যন্তরেই মুসলমানদের সাথে একত্রে বসবাসকারী মুনাফেকরা বিদ্যমান ছিল, যাদেরকে ঘরের শত্রু বললেও নিশ্চিতভাবে কোনো অত্যুক্তি হবে না। তাদের ছাড়াও বিশ্বাসঘাতকতা এবং গুপ্ত ষড়যন্ত্রে অভ্যস্ত ইহুদিরাও ছিল যাদের শত্রুতার গভীরতা ও প্রসারতা চরম পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। সুবহানাল্লাহ্ সেই প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের জন্য এটি কীরূপ বিপদের দিন ছিল! স্বয়ং তাদের মুখ থেকেই শুনুন। হযরত উবাই বিন কাব বর্ণনা করেন যে, সে যুগে সাহাবীদের অবস্থা এমন ছিল যে, তারা হঠাৎ কোথাও আক্রান্ত না হয়ে যান- এই আতঙ্কে রাতের বেলা অস্ত্র-সস্ত্র সাথে নিয়ে ঘুমাতেন এবং দিনের বেলাতেও সর্বদা অস্ত্রে সজ্জিত থাকতেন। তারা পরস্পর বলাবলি করতেন যে, দেখা যাক! আমরা সেই দিন পর্যন্ত জীবিত থাকি কি-না যেদিন আমরা শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে জীবন যাপন করব এবং খোদা তা'লা ছাড়া আমাদের আর কারো ভয় থাকবে না।"

এই বাক্যাবলীতে কতটা বিপদ এবং অসহায়ত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এবং শান্তি ও নিরাপদ জীবন যাপনের কতটা ব্যকুলতা লুক্কায়িত আছে প্র ত্যেক ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি এর অনুমান করতে পারবেন।"

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৪৬৪-৪৬৫)

বর্তমানেও কতক স্থানে একই অবস্থা বিদ্যমান রয়েছে, বিশেষ করে ফিলিস্তিনে।

যায়েদ বিন হারেসা (রা.)-এর নেতৃত্বে একটি অভিযানের ঘটনা রয়েছে। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো, বনু সুলায়েমের পরাজয়, বনু গাতফানের দেশান্তর, সাবীকের যুদ্ধে আবু সুফিয়ানের পলায়ন এবং বনু গাতফানের যুদ্ধে বনু সালেবা ও বনু মুহারেবের পরাজয়-এ ঘটনাসমূহ মদিনার সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির প্র মাণ বহন করছিল। সবচেয়ে বড় বিষয় হলো, বদরের যুদ্ধে ঈমানদারদের সফলতা এবং মুশরেকদের লাঞ্ছনাজনক পরাজয়ের কারণে ইসলামের শত্রুরা অর্থ নৈতিক সমস্যা ও সঙ্কটের কারণে ভীষণ বিচলিত হয়। কেননা মক্কা থেকে সিরিয়াগামী প্রসিদ্ধ প্রধান সড়ক মদিনার পশ্চিমে লোহিত সাগরের নিকটবর্তী ছিল। আবু সুফিয়ানের ব্যবসায়িক কাফেলাকে মুসলমানরা এ রাস্তাতেই পথরোধ করার চেষ্টা করেছিল। মদিনার পার্শ্ববর্তী গোত্রগুলোও মহানবী (সা.)-এর সাথে সন্ধিচুক্তি করেছিল। একারণে মক্কার মুশরেকরা এই রাস্তাকে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে কোনোভাবেইপ্রস্তুত ছিল না। মুসলমানদের পক্ষ থেকে মুশরেকদের বিরুদ্ধে অর্থ নৈতিক অবরোধের কারণে তারা (অর্থাৎ মুশরেকরা) ভীষণ উদ্বিগ্ন হয় এবং সিরিয়ার প্রসিদ্ধ সড়ক ছেড়ে নতুন রাস্তার সন্ধানে রত থাকে। একদিন সাফওয়ান বিন উমাইয়্যা মক্কার কাফেরদেরকে বলে যে, মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীরা আমাদের বেঁচে থাকাই কঠিন করে দিয়েছে। আমাদের ব্যবসায়িক কেন্দ্রে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। এখন বুঝতে পারছি না- আমাদের কী করা উচিৎ? তারা তো সমুদ্র সৈকত থেকে পশ্চাৎপদ হওয়ার নামও নিচ্ছে না। সৈকতের নিকটেবসবাসরত অধিকাংশ গোত্রও তাদের সাথে সন্ধিচুক্তি ও সমঝোতা করে তাদের সাথে যোগ দিয়েছে। এখন আমরা যাবই বা কোথায় আর করবই বা কী? এখানে মক্কায় বসে থাকলে আমাদের মূলধনও খেয়ে শেষ করে ফেলব, যা কিছু আমাদের কাছে আছে সবকিছু খেয়ে শেষ করে ফেলব। এরপর আমাদের কাছে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না যা অবলম্বন করে আমরা জীবন যাপন করতে পারি। এই মালপত্রই তো আমরা গ্রীষ্মকালে সিরিয়া এবং শীতকালে ইথিওপিয়ায় ব্যবসার উদ্দেশ্যে নিয়ে যেতাম। এখন কী হবে? সাফওয়ান বিন উমাইয়্যার এই কথা শুনে সবাই উৎকণ্ঠিত ছিল। আসওয়াদ বিন মুত্তালেব পরামর্শ দেয় যে, সমুদ্র সৈকতের পথ ছেড়ে ইরাকের পথে সিরিয়া যাওয়া যেতে পারে। সাফওয়ান বলল, এই রাস্তা সম্পর্কে

## যুগ ইমামের বাণী

**যাঁর আশিস ও কল্যাণের ধারা সদা প্রবাহমান, তিনিই হলেন জীবিত নবী। (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬২৯)**

দোয়াপ্রার্থী: Qazi Abdur Rashid, Basantapur, 24 PGS (S)

আমার কোনো ধারণা নেই। আবু যামআ' বলে, আমি তোমাকে এমন এক পথপ্রদর্শক সম্পর্কে অবহিত করছি যে এই রাস্তা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখে। সে বলে, সে হলো ফুরাত বিন হাইয়ান ইজলী। সে এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে এবং সে এই পথ সম্পর্কে উত্তমভাবে পরিচিত। সাফওয়ান আল্লাহ্‌র শপথ করে বলে, খুবই ভালো হলো! আমি তো এটিই চাচ্ছিলাম। ফুরাতকে ডাকা হয়। তার আসার পর সাফওয়ান তাকে বলে, আমি বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে সিরিয়া যেতে চাই। মুহাম্মদ (সা.) আমাদের বাণিজ্যের ব্যাপারে আমাদেরকে যন্ত্রণা দিচ্ছেন, কেননা আমাদের বাণিজ্যিক কাফেলা তাঁদের পাশ দিয়েই অতিক্রম করে। আমি ইরাকের পথ ধরে সিরিয়া যেতে চাই। ফুরাত বলল, আমি তোমাকে ইরাকের এমন পথ দিয়ে নিয়ে যাব যে পথ সম্পর্কে মুহাম্মদ (সা.)-এর সঙ্গী-সাথীরা কোনোভাবেই খবর পাবে না। এটি জল ও তৃণহীন এবং জনমানবশূণ্য পথ। সাফওয়ান বলে, আমিও এটিই চাই। এই নির্জন মরুপথ আমাদের জন্য তেমন কোনো দুশ্চিন্তার কারণ হবে না, কেননা এখন শীতকাল তাই পথে আমাদের পানির প্রয়োজন খুব কমই হবে যা আমরা সইতে পারব।

যাহোক, যাত্রার প্রস্তুতি আরম্ভ হয়ে যায়। অতঃপর সাফওয়ান বিন উমাইয়্যা সবাইকে কাফেলার প্রস্তুতির জন্য বলে দেয়। জমানো মূলধন নিজের সাথে নেয়, রূপার পাত্র, রূপার ঝুড়ি এবং অন্যান্য উপকরণাদিও সাথে নেয়। আবু যামআ'ও সাফওয়ানকে তিনশত মিসকাল সোনা এবং রূপার ঝুড়ি দেয় যেন সে তার জন্য মালামাল ক্রয় করতে পারে। এক মিসকাল সোনা প্রায় সোয়া চার গ্রাম বা ৪.৩৭ গ্রামের সমান ওজন হয়। যাহোক, এগুলো যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। এক রেওয়ায়েতে এটিও বর্ণিত হয়েছে যে, সাফওয়ান বহু পরিমাণেমালপত্র নিয়ে যাত্রা করে, যেগুলোর মাঝে রূপার ঝুড়ি এবং রূপার পাত্র ছিল আর সেগুলোর ওজন ত্রিশ হাজার দিরহাম মূল্যের পুঁজির সমপরিমাণ ছিল। আবু সুফিয়ান বিন হারবও নিজের সাথে বিপুল পরিমাণ রূপা নিয়ে যাত্রা করে। অন্যান্য কুরাইশ সদস্যরাও নিজ নিজ ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য সোনা-রূপা প্রভৃতি কাফেলায় অন্তর্ভুক্ত লোকদের হাতে তুলে দেয়। সাফওয়ান এবং আবু সুফিয়ান ছাড়াও আরো কিছু লোক এই বানিজ্য কাফেলার যাত্রাসঙ্গী হয়; যেমন, আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই রাবিআ', হাওয়ায়তিব বিন আব্দুল উয্যা প্র ভৃতি। এভাবে ফুরাত বিন হাইয়্যানের পথপ্রদর্শ নে ইরাকের পথে সিরিয়ায় বাণিজ্যের জন্য কুরাইশের এই কাফেলা যাত্রা আরম্ভ করে।

অভিযানের তারিখ এবং অন্যান্য নাম সম্পর্কে এসেছে যে, এই অভিযান তৃতীয় হিজরী সনের জমাদিউল আখের মাসে সংঘটিত হয়েছিল। অভিযানের স্থানের প্রেক্ষিতে এই অভিযানকে কারাদা অভিযানও বলা হয়। কারাদা নাজাদ-এর ঝরনাগুলোর মাঝে একটি ঝরনা। মক্কার কুরাইশরা পরম সাবধানতার সাথে এই পথ অবলম্বন করে যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। তাদের প্রচেষ্টা ছিল যে, কোনোভাবেই যেন এর সংবাদ মদিনায় না পৌঁছে,

নতুবা এই পথ দিয়ে যাওয়া আমাদের জন্য অসম্ভব হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার পরিকল্পনা ভিন্ন ছিল। মক্কাবাসীদের পক্ষ থেকে এই সংবাদ গোপন রইল না। অতএব নুআয়েম বিন মাসউদ আশজাঈ এই পরিকল্পনার কথা জানতে পারেন। সেদিনগুলোতে সে কোনো কাজে মদিনায় যায়। সে তখনও অমুসলিম ও মুশরেক ছিল। সে মদিনার বনু নযির গোত্রের সর্দার কেনানা বিন আবি হুকায়েক এর গৃহে অবস্থান করে। সে তাকে সুরা পান করায়। এক সাহাবী সালীত বিন নু'মান বিন আসলাম (রা.) বনু নাযির গোত্রে প্রায়শ যাতায়াত করতেন। সেই মুহূর্তে তিনিও সেখানে উপস্থিত হন যেখানে কেনানা বিন আবি হুকায়েক ও নুআয়েম আসর জমিয়ে বসেছিল। নুআয়েম মদের নেশায় মাতাল ছিল। তাই সে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেনি আর মাতাল অবস্থায় গোপন বিষয় ফাঁস করে দেয়। সে সাফওয়ান বিন উমাইয়্যার নেতৃত্বে ইরাকের পথ ধরে সিরিয়ার দিকে যাত্রাকারী বাণিজ্য কাফেলা সম্পর্কে সবকিছু বলে দেয়। সালীত বিন নু'মান শোনামাত্রই বাইরে আসেন এবং গিয়ে এসবকিছু মহানবী (সা.)-এর কর্ণগোচর করেন। মহানবী (সা.) এই সংবাদ পাওয়া মাত্রই তৎক্ষণাৎ প্রস্তুতি গ্র হণ আরম্ভ করেন এবং একশত অশ্বারোহীর সৈনদল প্রেরণ করেন। এর নেতৃত্ব তিনি (সা.) হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.)-কে প্রদান করেন।

## মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

**" তুচ্ছ এ জীবন যাকে নিয়ে এত গর্ব করা হয়। চিরন্তন আনন্দের জীবন সেটিই যা মৃত্যুর পর লাভ হয়।"**

**(মমালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৬)**

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.)-এর এটি প্রথম কোনো অভিযান ছিল যেখানে তাকে কোনো ইসলামী সৈন্যদলের নেতৃত্ব প্রদান করা হয়েছিল। তিনি এই সামরিক অভিযানে সফলতা লাভ করেছিলেন।

এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.)-কে একশত আশ্বারোহীর সাথে প্রেরণ করেন। তিনি তাদের (কাফেলার) উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং কাফেলাকে ধরে ফেলেন। কাফেলার সর্দাররা জঙ্গালের দিকে পালিয়ে যায়। সাহাবীরা একজন কিংবা দুজনকে বন্দি করে এবং কাফেলার মালপত্র নিয়ে মহানবী (সা.)-এর কাছে যান। তিনি (সা.) এগুলোকে পাঁচটি ভাগ করেন এবং এক-পঞ্চমাংশ বিশ হাজার দিরহামের সমান হয়। অবশিষ্ট সম্পদ তিনি (সা.) অভিযানকারীদের মাঝে বণ্টন করে দেন।

(দায়েরায়ে মারেফ, সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৩৯৫-৩৯৮) ( ফারহাঙ্গে সীরাত, পৃ: ২৩৩)

আরেকটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত যায়েদ (রা.) ক্ষীপ্র গতিতে দূরত্ব অতিক্রম করেন আর যখন কি না কুরাইশদের কাফেলা সম্পূর্ণ অনবহিত অবস্থায় কারাদা নামক একটি ঝরনার পাশে অবস্থানের জন্য থেমেছিল তখন তাদের ধরে ফেলেন এবং আচমকা আক্রমণকরে পুরো কাফেলা দখল করে নেন। সাফওয়ান বিন উমাইয়্যা এবং অন্যদের পালানো ছাড়া গত্যন্তর রইল না। মুসলমানরা কাফেলার পথপ্রদর্শক ফুরাত বিন হাইয়ান এবং বলা হয়ে থাকে, আরো দুই ব্যক্তিকে বন্দি করে। কাফেলার নিকট থাকা থালাবাটি ও রূপার একটি বিশাল পরিমাণ যার মূল্যমান এক লক্ষ দিরহাম ছিল- তা হস্তগত হয়। মহানবী (সা.) সেখান থেকে এক-পঞ্চমাংশ বের করে বাকি গনিমতের মালামাল সৈন্যদের মাঝে বণ্টন করে দেন। কুরাইশদের পথপ্রদর্শক ফুরাত বিন হাইয়ান মহানবী (সা.)-এর পবিত্র হাতে ইসলাম গ্রহণ করে।

(আররাহীকুল মাখতুম, পৃ:৩৩৭)

এর বাকি অংশ আগামীতে বর্ণিত হবে, ইনশাআল্লাহ্।

এই যে কাফেলা যাত্রা করত, তাদেরকে এ কারণে থামানো হতো, কেননা তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য মালামাল একত্রিত করত। বর্তমানে যেভাবে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়, এটি সে ধরনেরই একটি বিষয় ছিল। তারা তো এটি নিজেদের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য করে থাকে, বরং অনেক স্থানে অন্যায় পন্থা অবলম্বন করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, আমেরিকা উগান্ডার ওপর এজন্য নিষেধাজ্ঞা লাগিয়েছে, কেননা তারা পার্লামেন্টে এলজিবিটিএর বিরুদ্ধে আইন পাশ করিয়েছে। যদিও এর নাম তারা নেয় না, কিন্তু মূল কারণ এটিই। অতএব এ হলো তাদের অবস্থা, তারা আবার ইসলামের ওপর কিবা আপত্তি করবে! যাহোক, এসব বিষয় আগামীতেও বর্ণনা হবে, ইনশাআল্লাহ্।

পুনরায় ফিলিস্তিনের অত্যাচারিতদের জন্য দোয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। এখন অন্ততপক্ষে এতটুকু হয়েছে যে, কিছু অমুসলিম এবং কতিপয় রাজনীতিবিদ ভয়ে ভয়ে হলেও কিছু না কিছু এ অত্যাচারের বিরুদ্ধে বলা আরম্ভ করেছে; বরং এখন তো কিছু ইহুদিও এ আচরণে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে এবং ইসরাইল সরকারকে বলেছে, আমাদের দুর্নাম কেন করছো! সর্বোপরি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিবাদ কোনো না কোনো স্থান থেকে অন্যদের মাঝেও আরম্ভ হচ্ছে। এখন তারা বলছে, দৈনিক চার ঘণ্টা যেন যুদ্ধ বন্ধ রাখা হয়, যাকে তারা Pause (বিরতি) নাম দিয়েছে, যেন ফিলিস্তিনবাসীর নিকট সাহায্যসামগ্রী পৌঁছাতে পারে। আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন যে, তারা এর ওপর কতটা আমল করবে এবং বাকি বিশ ঘণ্টায় ফিলিস্তিনীদের ওপর কতটা অত্যাচার চালাবে! আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন, কী পরিমাণ বোমাবর্ষণ করবে!

অধিকাংশ বড় বড় রাষ্ট্র এবং রাজনীতিবিদরাও ফিলিস্তিনবাসীর জীবনকে মূল্যায়ন করছে না। তাদের নিজস্ব স্বার্থ রয়েছে, কিন্তু সর্বোপরি তাদেরও মনে রাখা উচিত, আল্লাহ্ তা'লাও একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দেন আর কেবল এই দুনিয়াতেই সব শেষ নয় বরং পরজগৎও রয়েছে।

তারা মনে করে, এখানে এই জগতে আমরা লাভবান হলেই সবকিছু পেয়ে যাব। এ পৃথিবীতেও ধৃত হতে পারে এবং পরকালেও ধৃত হবে। যাহোক, আমাদের দোয়ার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা অত্যাচারিত ফিলিস্তিনীদের সাহায্য করার মাধ্যমে তাদেরকে এসব অত্যাচার-নিপীড়ন থেকে মুক্তি প্রদান করুন।

এ পর্যায়ে আমি নামাযের পর গায়েবানা জানাযার নামায আদায় করব। প্রথম জানাযাবা একটি জানাযা হলো মানসুরা বাসমা সাহেবার যিনি হামিদুর রহমান খান সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। কিছুদিন পূর্বে তিনি মৃত্যু বরণ করেন, *'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন'*। তিনি নওয়াব আব্দুল্লাহ্ খান

সাহেব এবং হযরত সাহেবযাদী আমাতুল হাফীয বেগম সাহেবার পৌত্রী ছিলেন। হযরত মির্যা শরীফ আহমদ সাহেব এবং আবু যয়নব বেগম সাহেবার দৌহিত্রী ছিলেন। মিয়াঁ আব্বাস আহমদ খান সাহেব এবং আমাতুল বারী বেগম সাহেবার কন্যা ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তিনি ওসীয়্যতকারিণী ছিলেন, পুণ্যবতী ছিলেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) যখন তার বিয়ে পড়ান তখন যে খুতবা দিয়েছিলেন তার মধ্যে কিছু উপদেশবাণীও ছিল তাই আমি সেই খুতবার কিছু অংশ শুনিয়েও দিচ্ছি। তিনি (রাহে.) বলেন, বিয়ের মাধ্যমে মেয়ে এবং ছেলের ওপর নতুন এমন দায়িত্ব াবলীঅর্পিত হয় যা এর পূর্বে তাদের ওপর অর্পিত ছিল না। তিনি (রাহে.) বলেন, একটি হলো স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক দায়িত্বাবলি অর্থাৎ স্ত্রীর প্রতি স্বামীর এবং স্বামীর প্রতি স্ত্রীর দায়িত্ব। আর দ্বিতীয়ত উভয়ে মিলে কিছু দায়িত্ব পালন করতে হয় যেগুলোর সম্পর্ক তাদের সন্তানদের সাথে হয়ে থাকে। সন্তানদের যতটুকু সম্পর্ক রয়েছে সেক্ষেত্রে কিছু দায়িত্বাবলি ভাগ করা থাকে। যেমন- মা বাচ্চাকে দুধ খাওয়ায়, বাবা খাওয়ায় না। বাবা ঘরের বাইরে বাচ্চাদের খেয়াল রাখে যাতে তাদের মাঝে বখাটেপনা সৃষ্টি না হয়। নারীদের দায়িত্ব বাড়ির চতুঃসীমার সাথে সম্পৃক্ত। যাহোক, এরা উভয়ে যদি নিজ নিজ দায়িত্বাবলি পালন করে তবে বর্তমানেও অনেক অনিষ্ট থেকে আমাদের সন্তানরা রক্ষা পেতে পারে। অতঃপর তিনি (রাহে.) বলেন, আমরা এই শুভক্ষণে যে আয়াতগুলো পাঠ করি সেখানে আল্লাহ্ তা'লা এ ধরনের নতুন দায়িত্বাবলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, প্রথম আবশ্যকীয় বিষয় হলো, يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ এখানে আয়াতে 'ইত্তাকুল্লাহ্' শব্দ রয়েছে আর বহু প্রসঙ্গে 'তাকওয়া'র উল্লেখ রয়েছে,কিন্তু এই আয়াতে যা বিয়ের সময় পাঠ করা হয় সেখানে প্রতিপালক -প্রভুর তাকওয়া (অবলম্বনের কথা বলা হয়েছে)। আর এই 'প্র তিপালক-প্রভুর তাকওয়া' কথার অর্থ হলো, যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা নিজ বান্দাদের প্রতিপালনকারী তদ্রুপ তোমাদের দুজনেরও প্রতিপালনকারী। একইভাবে তোমাদের ওপরও কিছু নতুন প্রতিপালনের দায়িত্ব অর্পিত হতে যাচ্ছে আর তোমরা তখনই তা পালন করতে পারবে যখন তোমরা সত্যিকার প্রতিপালকপ্রভু আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন করবে। দ্বিতীয়ত, এই সম্পর্ক অত্যন্ত স্পর্শকাতর হয়ে থাকে। অসাবধানতাবশত অনেক ভুল ধারণা সৃষ্টি হতে পারে এবং সেগুলো থেকে রক্ষা পেতে আমাদেরকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, 'কুলু কাউলান সাদিদা' অর্থাৎ কেবল সত্য বললেই এখানে কার্যসমাধা হবে না, বরং এমন কথা যাতে কোনো প্রকার বক্রতা থাকবে না, সোজা হবে, সেই পথ যদি তোমরা অবলম্বন করো তবে তোমাদের মাঝে কোনো ভুল বোঝাবুঝি, কোনো মনোমালিন্য সৃষ্টি হবে না। আর তৃতীয়ত, وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ অর্থাৎ তোমাদের বয়োজ্যেষ্ঠরা ভবিষ্যতের ভাবনা ভেবেই তোমাদের তরবিয়ত করেছেন এবং তোমাদেরও নিজেদের ভবিষ্যতের চিন্তা করে আপন সন্তানদের তরবিয়ত করতে হবে। এই যে 'ভবিষ্যৎ' শব্দটি, যার সম্পর্ক সেই তরবিয়তের সাথে রয়েছে যা পিতামাতারা নিজ সন্তানদের করে থাকে, এটি প্রত্যেক প্রজন্মের পৃথক ভবিষ্যৎ হয়ে থাকে। এটি একই ধরনের ভবিষ্যৎ নয়, কেননা পৃথিবী এবং পৃথিবীর সমাজ পরিবর্তনশীল। তিনি (রাহে.) বলেন, বর্তমানে পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে কিছু থেকে ভিন্ন কিছু হয়ে গেছে! সেই মহান বৈপ্লবিক পরিবর্তন যার সুসংবাদ সর্বদা দেয়া হয়েছিল, দিগন্তে আমরা তার লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। তাই বর্তমানে পিতার দায়িত্বাবলি সেই দায়িত্বের চেয়ে ভিন্ন যা আমাদের দায়িত্ব ছিল। বরং অধিক সাবধানতার সাথে, অধিক ব্যাপক দায়িত্বাবলিকে দৃষ্টিপটে রেখে নিজেদের সন্তানদের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে, যাতে আহমদীয়াতের তরবিয়তের দায়িত্ব, অর্থাৎ সেই তরবিয়ত যার সম্পর্ক পুরো জগতের সাথে, আগামী প্র জন্মের ওপর অর্পিত হবে তখন প্রত্যেক আগামী প্রজন্ম সেই দায়িত্ব গ্রহণে প্রস্তুত থাকে। তিনি (রাহে.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের এসব বিষয় বুঝার এবং এগুলোর ওপর আমল করার সামর্থ্য দান করুন।

অতঃপর তিনি (রাহে.) বলেন, যে বিয়ের জন্য আমি দাঁড়িয়েছি তা এক স্নেহের কন্যার, যে আমাদের ছোটো ফুপা নওয়াব আব্দুল্লাহ্ খান সাহেব এবং ফুপি আমাতুল হাফীয বেগম সাহেবার পৌত্রী। তিনি (রাহে.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর চতুর্থ প্রজন্ম আরম্ভ হয়েছে। হযরত মির্যা শরীফ আহমদ সাহেবের দৌহিত্রী তিনি। তিনি (রাহে.) বলেন, অন্য দিক থেকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথেও সম্পর্ক আছে। তাই দায়িত্বাবলিও দ্বিগুণ। আর দায়িত্বাবলি দ্বিগুণ হলে ভয়ও দ্বিগুণ। একারণে আমাদের জন্য সুসংবাদও দ্বিগুণ। অতঃপর তিনি (রাহে.) খানদানের সন্তানদের এবং বড়োদেরও বুঝিয়েছেন, তাদের নিজেদের দায়িত্বাবলি বুঝা উচিত, কেননা দ্বিগুণ দায়িত্বাবলি পালন না করলে দ্বিগুণ শাস্তিও ভোগ করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা খানদানের বড়োদের এবং সন্তানদের এ বিষয়টি বুঝার সামর্থ্য দান করুন।

অতঃপর তিনি (রাহে.) বলেন, আমি যখন এমন কোনো বিয়ে পড়াই যেখানে ছেলেও মেয়ের হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকে, তখন আমার মাঝে একটি চিন্তাও কাজ করে এবং দোয়ার প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি হয় যেন আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে সেই মানকে চেনার সৌভাগ্য দান করেন। তারা সেবক হিসেবেও অন্যদের থেকে ভিন্ন এবং তাদের আরও বড় সেবক হয়ে পৃথিবীতে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করা উচিত।

(খুতবাতে নাসের, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৭১০-৭১৩)

যাহোক, এগুলো উপদেশবাণী ছিল, তাই আমিও বর্ণনা করে দিলাম। তার অর্থাৎ প্রিয় মনসুরা বাসমা-র ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে তার মেয়ে রাবেয়া লিখেন, আমাদেরকে বাল্যকালেই আল্লাহ্ তা'লার সাথে পরিচয় করিয়েছেন। নিজের ভাগ্যের জন্য দোয়ার প্রতি জোর দিতেন। প্রায়ই বলতেন, দোয়া করো যাতে আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের ভালোমানুষদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করান। আর এই দোয়ার অর্থ আমরা বড়ো হওয়ার পর বুঝতে পেরেছি, ছোটো থাকতে সেভাবে বুঝতাম না। তিনি বলেন, আমার মা মানুষকে খুব ভালোবাসতেন। নিজের সত্তাকে কুরবানী দিয়ে মানুষের খেয়াল রাখতেন আর এটিই বাস্তবতা। বাহ্যত মানু ষ মনে করত যে, তিনি নিজের জন্য ব্যয় করে থাকেন কিন্তু না, তিনি নিজেরটা কুরবানী করতেন এবং অন্যদের খেয়াল রাখতেন। উদাহরণস্বরূপ, জলসার সময় লন্ডনে আসলেও দরিদ্রদের জন্য উপহার নিয়ে যেতেন, কিন্তু নিজের জন্য কিছু নিতেন না। একটি মেয়েকে তিনি পালনও করেছন এবং তাকে উত্তম তরবিয়ত দিয়েছেন তারপর তার বিয়েও দিয়েছেন। এছাড়াও অনেক মেয়েদের তিনি বিয়ে দিয়েছেন। আর বাড়িতেও মানুষের আসা-যাওয়া থাকত। প্রতিবেশীদেরও খাবার ইত্যাদি পাঠাতেন। একপ্র কার লঙ্গারখানা চালু ছিল। এমনকি বাইরে রাস্তা ঝাড়ু দিত যে ব্যক্তি সে-ও খাবারের সময় হলে তার কাছে এসে খাবার খেত। অনেক মানুষকে তিনি ভাতা প্রদান করতেন। তাকে যদি বলা হতো, নিজের জন্য কিছুটা জমা করুন, উত্তরে তিনি বলতেন, আমি আগামীকাল সম্বন্ধে কখনো কিছু চিন্তা করিনি। আল্লাহ্ তা'লা আমার আর্থিক প্রয়োজনের মালিক। ওয়াকেফে যিন্দেগীদের অনেক সম্মান করতেন, শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন, তাদের খেয়াল রাখতেন। আত্মীয়দের মাঝে যারা ওয়াকেফে যিন্দেগী তাদের সাথে সম্পর্ক রাখতেন, দাওয়াত দিতেন এবং তিনি বলেন, আমাদেরকেও বলতেন, ওয়াকেফে যিন্দেগীরা তো কুরবানী করে তাই তাদের খেয়াল রাখা উচিত। প্রতিটি সম্পর্ক খুব ভালোভাবে পালন করেছেন। সর্বদা বলতেন, আমি এ চিন্তা করি না যে, অন্যরা আমার সাথে কী করেছে? আমি তো যখনই কোনো ভুল হতো, কখনো বাড়াবাড়ি হয়ে গেলে সবার আগে ক্ষমা চাইতাম। কর্মচারীদের বকাঝকা করলে তাদের কাছেও ক্ষমা চাইতেন এবং পুরস্কারও দিতেন।

তার জামাতা মির্যা তাকিউদ্দীন বলেন, অনেক ছোটো বয়সেই তিনি ওসীয়্যত করেছিলেন। আমিও দেখেছি, প্র থমে ওসীয়্যত ফর্ম দেখে তো হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম যে, প্রায় চৌদ্দ বছর বয়সে তিনি ওসীয়্যত করেছিলেন। বাল্যকালের কথা বলেন যে, তিনি একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি স্ব প্নে দেখেছিলেন, আমি আল্লাহ্ তা'লার পা শক্ত করে ধরে কাঁদছি। আর যখন আমি জাগ্রত হই তখন দেখি, সত্যিই কাঁদছি। তিনি বলেন, এখনও আল্লাহ্ আমার সমস্ত কাজ সম্পন্ন করে দেন।

এখানে তার এক পরিচিতজন রূহী শাহ সাহেবা বলেন, বন্ধুত্ব করলে তা খুব ভালোভাবে রক্ষা করতেন। অত্যন্ত কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট, তাঁর নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায়কারী এবং মানুষের সাথে অনুগ্রহপূর্ণ আচরণ করতেন। এছাড়া অনেক বেশি কৃতজ্ঞতা আদায় করতেন, এতটাই করতেন যে, মানুষ লজ্জিত হতো।

তার ভ্রাতৃজায়া তাহেরা ফারুক সাহেবা বলেন, ভাবির পরিবর্তে তিনি আমাকে বন্ধু এবং বোন বানিয়ে রেখেছিলেন। নিঃস্বার্থ ভালোবাসা প্রদর্শনকারিণী, নিখাদ ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী ছিলেন। সম্পর্ক রক্ষা করতে জানতেন। নিজের জন্য যা পছন্দ করতেন তা অন্যদের জন্যও পছন্দ করতেন এবং কখনো কোনো কথা মনে পুষে রাখতেন না। স্বচ্ছনির্ভেজাল কথা বলতেন। নামায-রোযা পালনকারী, কুরআন করীম তিলাওয়াতকারিণী, খিলাফতের সাথে প্রগাঢ় সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতা ছিল। জামা'তের যে কাজই অর্পিত হতো সানন্দে তা পালন করতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও অনুগ্রহসুলভ আচরণ করুন এবং তার সন্তানসন্ততিদেরও তার পুণ্যসমূহ অব্যাহত রাখার সামর্থ্য দান করুন। তার স্বামী জীবিতআছেন, তাকেও ধৈর্য ও মনোবল দান করুন। সন্তানসন্ততিদেরও ধৈর্য ও মনোবল দান করুন।

দ্বিতীয় জানাযা চৌধুরি রশিদ আহমদ সাহেবের, যিনি ফয়সালাবাদ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ডেপুটি রেজিস্ট্রার ছিলেন। সম্প্রতি আমেরিকায় বসবাস করতেন। কিছুদিন পূর্বে তিনিও মৃত্যুবরণ করেন। *'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন'*। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তিনিও ওসীয়্যতকারী ছিলেন।তার ছেলে রফিক তাহের সাহেব সেখানে অর্থাৎ লসএঞ্জেলস-এ জামা'তের সেবা করছেন। তিনি বলেন, আমাদের বংশে তার বড়ো ভাই চৌধুরি বরকত আলী সাহেবের মাধ্যমে আহমদীয়াত সর্বপ্রথম প্র বেশ করেছিল এবং তারপর তার পিতা ও বাড়ির অন্য সদস্যরা বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করে। ১৯৭৪-এর দাঙ্গায় একদল যদিও তার বাসা বিশ্ববিদ্যালয় সীমানার মধ্যে ছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোয়ার্টারগুলোর মধ্যে ছিল , কিন্তু তারপরও একদল আক্রমণ করে এবং ঘর লুটপাট করে তার সমস্ত জিনিসপত্র জ্বালিয়ে দেয়। যাহোক, তিনি তখন সেখান থেকে চলে যান। এরপর যখন পরিস্থিতি অনুকূলে আসে দু -তিন মাস পরে বিশ্ব বিদ্যালয়ে পুনরায় ফিরে আসেন। ভাইস চান্সেলর যিনি ক্রিসেন্ট মিলের মালিক, তিনি বলেন, আমি আপনার ক্ষতিপূরণ করতে চাই। আমাকে বলুন, কতটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে? প্রত্যুত্তরে চৌধুরি রশিদ আহমদ সাহেব আকাশপানে আঙুল উঁচিয়ে বলেন, মোটেও না। আমি কারো কাছ থেকে সাহায্য নেবো না। আমি আল্লাহ্ তা'লার রাস্তায় এ ক্ষতি সহ্য করছি, আল্লাহ্র পথে আমার এ ক্ষতি হয়েছে আর আল্লাহ্ তা'লাই ক্ষতি পুষিয়ে দিবেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা এমন অনুগ্রহ করেন যে, অনেক কম সময়ে সমস্ত ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়। খিলাফতের সাথে গভীর ভালোবাসা ও আনুগত্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। নির্দে শাবলীর প্রতিটি শব্দের ওপর আমল করার চেষ্টা করতেন। বিশ্বস্ততার মান এত উঁচুতে ছিল যে, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য ছিলেন। এটিও অনেক সম্মানের কারণ। একবার তিনি একটি মিটিংয়ে অংশগ্রহণের জন্য ট্রেনে এসি টিকিট পান। ফেরত যাওয়ার সময় তার কিছু আত্মীয়স্বজন বলে, আমরাও যাব। ফলে তিনি তার টিকিট পাল্টে দ্বিতীয় শ্রেণিতে আত্মীয়স্বজনের সাথে যান এবং বাকি টাকা সরকারকে ফেরত দেন। একবার তিনি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যানের অফিসে যান। সেখানে গিয়ে সাক্ষাতের জন্য নিজের কার্ড পাঠান। এতে ডিরেক্টর সাহেব নিজে বাইরে আসেন এবং সেখানে বসে থাকা তার এক বন্ধুকে বলেন, ই নিই সেই ব্যক্তি যার বিশ্বস্ততার কথা আমি আপনাকে বলছিলাম যে, এমন বিশ্বস্ত ব্যক্তি আছে। তিনি সেখানে সঙ্গে সঙ্গে নিজের জামা'তী পরিচয় তুলে ধরে বলেন, আমি আহমদী। এই সকল বিশ্বস্ততা যা আমার মাঝে বিদ্যমান তা আহমদী হওয়ার কারণেই। অতএব এটি আহমদীদের জন্যও একটি শিক্ষা যে, সর্বদা বিশ্বস্ততার সাথে নিজের কর্তব্য পালন করা উচিত এবং কখনো কোনো অর্থ লিপ্সা করা উচিত নয়।

তিনি চাঁদা দান, মালী কুরবানীর ক্ষেত্রে অগ্রগামী ছিলেন। পিতামাতা, ভাইবোন ছাড়াও মহানবী (সা.) এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পক্ষ থেকেও নিয়মিত তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা আদায় করতেন। অনেক ভালোবাসা প্রদর্শনকারী সত্তা ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্রদের সন্তান এবং ভাইয়ের মতো দেখেছেন। এক ওয়াক্তের নামায আমরা সবাই একত্রে তার বাসায় আদায় করতাম। বিশেষত মাগরিবের নামায। সদা হাস্যোজ্জ্বল মুখে সবার সাথে সাক্ষাৎ করতেন। অনেক মিতব্যয়ী মানুষ ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও অনুগ্রহের আচরণ করুন এবং তার সন্তানদেরও তার পুণ্যসমূহ অব্যাহত রাখার সামর্থ্য দান করুন। (আমীন)

**********

## ১২৮ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০২২ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৯, ৩০ ও ৩১ শে ডিসেম্বর ২০২৩ (শুক্র, শনি ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই দোয়ার সাথে এই মোবারক জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আল্লাহ্তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই জলসা সালানার সার্বিক সফলতার ও বরকত মণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং হেদায়েতের কারণ হওয়ার জন্য দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্সানুল জাযা।

(নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক রোগীর চিকিৎসা করানোর তৌফিক প্রদান করবেন আল্লাহ্ এবং আপনার মাধ্যমে তাদেরকে সুস্থতা দান করবেন।" একজন ওয়াক্ফে নও প্রশ্ন করেন, ওয়াক্ফে নও সদস্যদের কী ধরনের গঠনমূলক বিনোদনের অনুষ্ঠান দেখা উচিত। হুযূর আকদাস বলেন যে, টিভি নাটক বা চলচ্চিত্র দেখার পরিবর্তে, বিভিন্ন শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান দেখা উচিত। উপরন্তু, হুযূর আকদাস পুনরায় দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়ের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন যে, পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে, দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় একজন ব্যক্তিকে অনৈতিক কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে। আর তাই, যথাযথ পরিশ্রমের সাথে নামায আদায়ের জন্য সব ধরনের প্রচেষ্টা চালানো উচিত।হুযূর আকদাস আরও পরামর্শ দেন যে, কম্পিউটার এবং অনলাইন-গেম খেলা, যা মানুষকে অলস করে তোলে এবং তাদের মানসিক স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে, সে-সবের পরিবর্তে বাইরের কার্যক্রম ও খেলাধুলায় অংশ নেওয়া এবং বন্ধুত্বের জন্য ভাল সঙ্গী খোঁজা অধিকতর শ্রেয়।

অলসতা এবং তা এড়ানোর পদ্ধতি সম্পর্কিত আরেকটি প্রশ্নের উত্তরে হুযূর আকদাস বলেন যে, শিশু এবং কিশোর-তরুণদের কঠোর পরিশ্রম এবং ধারাবাহিকতার সাথে কাজ করার চেষ্টা করা উচিত। তাদের সময় যেন একটি ফলপ্রসূ এবং কার্যকর উপায়ে ব্যয় করা হয়, সেজন্য একটি দৈনন্দিন সময়-সূচি তৈরির পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র ইবাদতের মাধ্যমে প্রতিটিদিন [এর কার্যক্রম] শুরু করা উচিত।হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আমরা কীভাবে আলস্য থেকে মুক্তি পেতে পারি? দৃঢ়-সঙ্কল্পের মাধ্যমে। প্রতিজ্ঞা করুন যে, আপনি অলসতা প্রদর্শন করবেন না। প্রথমত, ফজরের নামাযের উদ্দেশ্যে ভোরে ঘুম থেকে উঠুন এবং তারপর পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করুন। দোয়া করার সময়ে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র নিকট নিজেদের আলস্য দূর করার জন্যও দোয়া করা উচিত।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"ব্যক্তিগত দৃঢ়-সঙ্কল্পই হলো সর্বপ্রধান বিষয়। এই ব্যাপারে অন্য কেউই আপনাকে সাহায্য করতে পারবে না। আপনার নিজেকেই এর জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। একজন ডাক্তার শুধুমাত্র ওষুধ দিতে পারেন। তিনি জোর করে আপনার মুখে ওষুধ ঢুকিয়ে দিতে পারবেন না। আপনাকেই স্বয়ং আপনার চিকিৎসা গ্রহণ করতে হবে। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায নির্ধারিত সময়ে আদায় করুন এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র নিকট আপনাদের অলসতা দূর করার জন্য দোয়া করুন।

(১ম পাতার পর.....)

যাদের কারো সেই বাদশাহকে দেখার সৌভাগ্য হওয়ার ছিল।"

অতঃপর তিনি লেখেন, 'সে মানুষের মনে এক প্রবল বাসনা সৃষ্টি করেছিল যে, সে তাদেরকে সুখে রাখবে এবং চিরকাল তাদের উপর রাজত্ব করবে। সে এত সংখ্যক দেশের উপর রাজত্ব করেছিল যে, গণনা করা সম্ভব নয়। সুদূর পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত তার সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল।"

সেই পুস্তকেই বর্তমান যুগের ইতিহাসবিদদের অভিমতের সারাংশ হিসেবে লেখা আছে- 'যদি ন্যায়-বিচারের জন্য লড়াই করা, এমনকি এর জন্য জীবন উৎসর্গ করাকে মহত্ব বলা যায়, তবে সে (সাইরাস) মহান সম্রাট ছিল।"

এরপর লেখা আছে, সে কেবল নিজের জন্য কিছুই করত না। যখন মেডিস, ব্যাবিলন ও মিসরের সাম্রাজ্য যৌথভাবে আক্রমণ করল, তখন সে কেবল প্রতিরক্ষার জন্য অস্ত্র ধারণ করেছিল। বস্তুত সে ছিল মূর্তিমান করুণা। তার বর্মে অন্যায়ের রক্তের দাগও ছিল না, প্রবল আক্রোশ বা অত্যাচারে তার হাতও রঞ্জিত হয় নি, সে ম্যাকডোনিয়া সম্রাটের ন্যায় শহরে অগ্নি-সংযোগও করে নি। সে অন্যান্য বাদশাহদের মত পরাজিত বাদশাহদের হাত-পা-ও ভেঙ্গে দেয় নি। সে কখনও রোমান বাদশাহদের ন্যায় পরাজিত বাদশাহদের ফাঁসিতেও ঝোলায় নি। সে কখনও গ্রীকদের উন্মাদ খোদা আলেকজান্ডারের ন্যায় রক্তপাতও ঘটায় নি। নিঃসন্দেহে সে এশিয়ান ছিল, কিন্তু এমন মানুষদের মধ্যে ছিল যারা সমসাময়িক যুগের অনেক আগেই জন্মগ্রহণ করে।"

সে অন্যান্যদের তুলনায় অনেক কোমল হৃদয় ছিল। সে তার জাতির রীতি-নীতি থেকে অনেক এগিয়ে ছিল। মানব প্রজন্মের যে পরম উন্নতি ভবিষ্যতে হওয়ার ছিল, সে তার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তার শক্তিশালী সাম্রাজ্যের ভিত্তি ছিল প্রতিবেশী দেশগুলি জয় করে তাদের মানোয়ন্ন ঘটানো এবং পরাজিতদের সমান অধিকার প্রদানের উপর। যে টায়র শহর নবুকদ নজর এবং আলেকজান্ডারে সামনে বিরাট অবরোধের পর আত্মসমর্পণ করেছিল, তারাই সাইরাস বাদশাহর আগমণ মাত্রই স্বেচ্ছায় নিজেদের শহরের সিংহদ্বার খুলে দিয়েছিল।

এরপর লেখেন, 'সর্বোপরি, সংখ্যায় নগণ্য হিসেবে পরিচিত ইহুদী জাতি ব্যাবিলন নদীর তীরে তাকে প্রবল উচ্ছ্বাসের সাথে তাকে স্বাগত জানিয়েছিল; কোন নশ্বর মানবকে এমন উষ্ণ অভ্যর্থনা তারা কখনও জানায় না।'

এর পর লেখা আছে, 'সে নিজের যুগে জন্মায় নি, বরং সে যুগকে সৃষ্টি করেছে, সে ছিল যুগের পিতা। মানব ইতিহাসে সে ছিল এক অনন্য ও অতুলনীয় সম্রাট।"

(তফসীর কবীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪৯৬)

**এটা কিভাবে সম্ভব যে, খোদা তা'লা কাউকে সশরীরে আকাশে তুলে নিলেন, অথচ তিনি আমাদের প্রিয় হযরত মহম্মদ (সা.) নন, বরং হযরত ঈসা (আ.)!**

**যদি তোমরা এই সব বিধিনিষেধ মেনে চল তবে তোমরা মুত্তাকি হতে পারবে। পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়, সম্ভব হলে বা-জামাত, এবং স্থায়ীভাবে ও যত্নসহকারে তা পড়। সমস্ত মনোযোগ এরই (নামাযের) প্রতি নিবদ্ধ কর। এরপর প্রতিদিন তিলাওয়াত কর আর কুরআন করীমের যতটুকু অংশ পাঠ কর তাতে এ বিষয়ের প্রতি যেন দৃষ্টি থাকে যে, আমাদের জন্য এতে কি আদেশ দেওয়া হচ্ছে। আর নিজের উন্নত নৈতিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট প্রদর্শন কর। অন্যদেরকে সৎ কথা বলার চেষ্টা কর।**

**আমাদের বিশ্বাস, আঁ হযরত (সা.) শেষ নবী, আর তিনি সকল দৃষ্টিকোণ থেকে আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে সবথেকে বেশি প্রিয় নবী ছিলেন। তাই আমাদের বিশ্বাস, আল্লাহ্ তা'লা সকল নবীর চাইতে তাঁকেই সব থেকে বেশি ভালবাসতেন।**

**আঁ হযরত (সা.) আমাদের জন্য একথাও বলেছিলেন যে, প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী চতুর্দশ শতাব্দীতে আবির্ভুত হবেন। এখন তো চতুর্দশ শতাব্দীও অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। কেবল একজনই দাবিদার আছে। আর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, তাঁর জামাত প্রতিনিয়ত উন্নতি করে চলেছে, যা থেকে প্রমাণ হয় যে, তিনিই প্রকৃত সত্তা আর এখন তো সময়ও অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এখন আর কোন ব্যক্তি আসবে না।**

**নাইজেরিয়ার আতফাল সদস্যের সঙ্গে ভার্চুয়াল (অনলাইন) সভা করেন খলীফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আই.)**

৮ জানুয়ারি ২০২২ নাইজেরিয়ার মজলিস আতফালুল আহমদীয়ার সদস্যদের সঙ্গে খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)। অনলাইন সাক্ষাত করেন।

হুযূর আকদাস টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে তাঁর কার্যালয় থেকে এ সভার সভাপতিত্ব করেন, আর নাইজেরিয়ার আতফালগণ নাইজেরিয়ার আজোকোরো, লোগোস থেকে যোগদান করেন।পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। আতফালবৃন্দ তাদের ধর্মবিশ্বাস এবং সমসাময়িক বিষয়াদি নিয়ে হুযূর আকদাসের নিকট বেশ কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করার সুযোগ লাভ করে।

প্রশ্ন: স্কুলে যখন কাউকে উত্যক্ত করা হয় এবং একথা বলে শাসানো হয় যে সে তার মা-বাবাকে যেন না বলে, অন্যথায় তাকে মারধর করা হবে, এমতাবস্থায় কি করা উচিত?

হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনার কাউকে ভয় পাওয়া উচিত নয়। আপনি আপনার পিতামাতা ও শিক্ষকদের জানানো উচিত। আপনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকেও জানাতে পারেন যে অমুক ব্যক্তি আপনাকে শাসানি দিচ্ছে যে, তার সম্পর্কে কাউকে জানানো হলে সে তাকে আরও বেশি করে উত্যক্ত করবে কিম্বা মারধর করবে। তাই আহমদীদের কাউকে ভয় পাওয়া উচিত নয়। আপনি যদি আপনার স্কুলের পরিবেশকে ভাল রাখতে চান তবে আপনাকে সাহসী হতে হবে।

প্রশ্ন: বিবাহের পূর্বে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর জীবিকা কি ছিল?

হুযুর আনোয়ার বলেন, তাঁকে শিক্ষাদানের জন্য তাঁর পিতা তিন জন শিক্ষক নিযুক্ত করে রেখেছিলেন। শিক্ষা লাভের পর তাঁর পিতা সরকারি একটি প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ আদালতে চাকরীর ব্যবস্থা করে দেন। সেই সূত্রে তিনি সিয়ালকোটে থাকতেন। তিনি সেখানেই আদালতে চাকরী করতেন। এটিই ছিল তাঁর জীবিকা। কিন্তু সিয়ালকোটে চাকরীরত অবস্থায় প্রায়শই খৃষ্টান পাদ্রীদের সঙ্গে মুবাহাসা করতেন। বহু পাদ্রীর সঙ্গে তিনি মোবাহাসা করেছেন। তাঁর যৌবনের প্রথমভাগ ইসলামের তবলীগ এবং খৃষ্টান পাদ্রীদের সঙ্গে মোবাহাসায় কাটিয়েছেন। তিনি সেই সময়ও ইসলামের মহান ধ্বজাবাহক ছিলেন। তিনি চাকরী তো করতেনই, সেই সঙ্গে তাঁর পিতা অনেক ধনী ব্যক্তি ছিলেন, যিনি সেই অঞ্চলের জমিদার ছিলেন। তাঁর পিতার মৃত্যুর পর সম্পত্তি থেকে উত্তরাধিকার হিসেবে অংশ পান এবং পরবর্তীতে নিজের ভাইয়ের উত্তরাধিকার থেকেও অংশ পান। তাঁর যেটুকু আয় ছিল তা তিনি সেই সব অতিথিদের সেবায় ব্যয় করতেন যারা তাঁর সাক্ষাতপ্রার্থী হিসেবে কাদিয়ান আসত। তাঁর দুই স্ত্রী ছিল। যৌবনেই তাঁর প্রথম বিবাহ হয় পিতার জীবদ্দশায়। প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে তাঁর দুই পুত্রের জন্ম হয়। এরপর তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করেন। দ্বিতীয়া স্ত্রী থেকে তাঁর একাধিক সন্তানের জন্ম হয়, যাঁর মধ্য থেকে পাঁচজন দীর্ঘ জীবন লাভ করেন। সেই সময় তাঁর আয়ের উৎস ছিল উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পত্তি।

প্রশ্ন: কিভাবে মুত্তাকী হওয়া যায়?

হুযুর আনোয়ার বলেন, আল্লাহ্ তা'লা যে সব আদেশ দিয়েছেন সেগুলি পালন করার চেষ্টা করুন। কুরআন করীমে আমাদের জন্য বহু আদেশ ও নিষেধ রয়েছে। সেই সঙ্গে রয়েছে কিছু মৌলিক বিষয়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যদি তোমরা এই সব বিধিনিষেধ মেনে চল তবে তোমরা মুত্তাকি হতে পারবে। পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়, সম্ভব হলে বা-জামাত, এবং স্থায়ীভাবে ও যত্নসহকারে তা পড়। সমস্ত মনোযোগ এরই (নামাযের) প্রতি নিবদ্ধ কর। এরপর প্রতিদিন তিলাওয়াত কর আর কুরআন করীমের যতটুকু অংশ পাঠ কর তাতে এ বিষয়ের প্রতি যেন দৃষ্টি থাকে যে, আমাদের জন্য এতে কি আদেশ দেওয়া হচ্ছে। আর নিজের উন্নত নৈতিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট প্রদর্শন কর। অন্যদেরকে সৎ কথা বলার চেষ্টা কর।

হুযুর আনোয়ার আরো বলেন, নিজের পড়াশোনার উপর জোর দাও, কেননা শিক্ষা এমন এক বিষয় যা আমাদের জন্য আবশ্যক। আর প্রত্যেক মুত্তাকি ব্যক্তির জন্য আবশ্যক করণীয় বিষয়টি পূর্ণ করার চেষ্টা করা উচিত। পড়াশোনা শেষ করার পর আপনি আহমদীয়া মুসলিম জামাত তথা দেশের জন্য এক কল্যাণকর সত্তা হয়ে উঠতে পারবেন। এই সমস্ত কিছু একত্রিত হলে তবেই আপনি মুত্তাকি হতে পারবেন।

প্রশ্ন:ইমাম মাহদীর আগমণ হয়ে গেছে একথা অ-আহমদীদের সামনে প্রমাণের জন্য সব থেকে শক্তিশালী প্রমাণ কোনটি?

হুযুর আনোয়ার বলেন: অনেক অ-আহমদী বা অন্যান্য মুসলমান এ বিষয়ের উপর ঈমান রাখে যে, মসীহ ও মাহদীর আবির্ভাব ঘটবে আর তারা বিশ্বাস করে যে, সেই মসীহ বা ঈসা আকাশ থেকে নেমে আসবেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বলেন, কোন মানুষই চিরকালের জীবন লাভ করতে পারে না। মানুষের জীবন এই পৃথিবীতেই শেষ হয়। আমাদের বিশ্বাস, আঁ হযরত (সা.) শেষ নবী, আর তিনি সকল দৃষ্টিকোণ থেকে আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে সবথেকে বেশি প্রিয় নবী ছিলেন। তাই আমাদের বিশ্বাস, আল্লাহ্ তা'লা সকল নবীর চাইতে তাঁকেই সব থেকে বেশি ভালবাসতেন। তাই এটা কিভাবে সম্ভব যে, খোদা তা'লা কাউকে সশরীরে আকাশে তুলে নিলেন, অথচ তিনি আমাদের প্রিয় হযরত মহম্মদ (সা.) নন, বরং হযরত ঈসা (আ.)! এছাড়া আঁ হযরত (সা.) নিজেই সুরা জুমআর 'ওয়া আখারিনা মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাকু বিহিম' আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন- শেষ যুগে এদের মত মানুষদের মাঝেই এক ব্যক্তির আবির্ভূত হবে। সাহাবাগণ জানতে চাইলেন, সেই লোকগুলি কারা হবে আর সেই ব্যক্তিই বা কে হবে যে শেষ যুগে পৃথিবীর বুকে আবির্ভূত হবে? সাহাবাগণ যখন এই একই প্রশ্ন তিন বার পুনরাবৃত্তি করলেন, তখন আঁ হযরত (সা.) হযরত সালমান ফার্সি (রা.) এর কাঁধে নিজের হাত রেখে বললেন, সলমান ফার্সির বংশধরদের মধ্য থেকে কোন এক ব্যক্তি শেষ যুগে আবির্ভূত হবে। এর অর্থ, সেই ব্যক্তি আরব বংশোদ্ভুত হবে না। মাহদী ও মসীহ এরই বংশধরদের মধ্য থেকে আসবে। এছাড়া আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, যখন সেই প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী দাবি করবেন, তখন স্বর্গীয় নিদর্শন প্রকাশ পাবে। আর সেই স্বর্গীয় নিদর্শনটি হবে রমযানের নির্দিষ্ট তিথি ও দিনে সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ সংঘটিত হওয়া। তিনি (সা.) বলেন, এই নিদর্শন এর পূর্বে কখনও প্রকাশ পায় নি। আমরা দেখতে পাই, সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের এই ভবিষ্যদ্বাণী সেই সময় ১৮৯৪ সালে পূর্ণ হয়েছিল, যখন কিনা মসীহ ও মাহদীর দাবীদার ইতিপূর্বেই বিদ্যমান ছিল। এই নিদর্শন পূর্ব ও পশ্চিম উভয় গোলার্ধে প্রকাশ পেয়েছিল। এই নিদর্শন সংবাদ-পত্রিকায় এখনও সংরক্ষিত আছে। এই সব ঘটনা ঘটে গেছে। আর

**সবসময় মনে রাখবেন যে, আপনি একজন ওয়াক্‌ফে নও। আপনাকে ভাল আচরণ প্রদর্শন করতে হবে এবং সবসময় আপনার সহপাঠী বালিকাদের এবং শিক্ষার্থীদের প্রতি ভদ্র ও দয়ালু হতে হবে এবং আচরণের এরূপ সর্বোচ্চ মান প্রদর্শন করতে হবে, যেন আপনার পরিচিত প্রতিটি ব্যক্তি আপনার উচ্চ স্তরের ভদ্রতা এবং উন্নত চরিত্রের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করে।**

**পার্থিব ক্ষেত্রে কারো সর্বদা নিজের চেয়ে কম সৌভাগ্যবানদের দিকে দৃষ্টিপাত করা উচিত আর এভাবে আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা যে অনুগ্রহরাজি বর্ষণ করেছেন তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি। তবে, ঈমান ও আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে, কারো তার চেয়ে উচ্চতর পদমর্যাদার ব্যক্তিদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা উচিত, আর তাদের সম-মর্যাদায় উপনীত হওয়ার এবং তাদেরকে ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত।**

**'যখন তোমরা তোমাদের ঘরের দেখাশোনা করো এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততির লালন-পালন ও পরবর্তী প্রজন্মের শিক্ষাপ্রশিক্ষণ দিয়ে থাক এবং ঘরের সুরক্ষা বিধান করে থাক, তখন তোমরা পুরুষদের মতোই প্রতিদান ও পুরস্কার পাবে'।**

**"নবুয়্যত ব্যতীত, পবিত্র কুরআন অনুসারে নারীরা সিদ্দিক (সত্যবাদী), শহীদ (ধর্মের পথে জীবন দানকারী) এবং সালেহাত (পুণ্যবতী) এর আধ্যাত্মিক মর্যাদা অর্জন করতে পারেন।**

**যখন সে সাত বছর বয়সে পৌঁছাবে তখন তার দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিয়মিত আদায় করা শুরু করা উচিত এবং পবিত্র কুরআন পাঠ শিখা এবং প্রতিদিন তা পাঠ করা উচিত।**

## বাংলাদেশের ওয়াক্‌ফে নও মেয়েদের সঙ্গে ভার্চুয়াল (অনলাইন) সভা করেন খলীফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আই.)

৩১ জানুয়ারি ২০২১ বাংলাদেশের ওয়াক্‌ফে নও স্কিমের ১৩০ জনেরও বেশি নারী সদস্যার সঙ্গে এক ভার্চুয়াল (অনলাইন) সভা করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)।

হুযূর আকদাস টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে তাঁর কার্যালয় থেকে এ সভার সভাপতিত্ব করেন, আর ওয়াক্‌ফে নও সদস্যগণ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের জাতীয় কার্যালয়, ঢাকার দারুত তবলীগ মসজিদ কমপ্লেক্স থেকে যোগদান করেন।পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এর পরে একটি নযম (ধর্মীয় কবিতা) এবং মহানবী (সা.)-এর হাদীস ও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর লেখনীর অংশবিশেষ পাঠ করা হয়।৫৫ মিনিটের এই সভার বাকি সময়ে, ওয়াক্‌ফে নও স্কিমের সদস্যারা তাদের ধর্মবিশ্বাস এবং সমসাময়িক বিষয়াদি নিয়ে হুযূর আকদাসের নিকট বেশ কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করার সুযোগ লাভ করেন।

নারীরা কোন পর্যায়ের আধ্যাত্মিক পদমর্যাদা লাভ করতে পারেন– এ বিষয়ক এক প্রশ্নের জবাবে হুযূর আনোয়ার মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন: "নবুয়্যত ব্যতীত, পবিত্র কুরআন অনুসারে নারীরা সিদ্দিক (সত্যবাদী), শহীদ (ধর্মের পথে জীবন দানকারী) এবং সালেহাত (পুণ্যবতী) এর আধ্যাত্মিক মর্যাদা অর্জন করতে পারেন। একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর একজন নারী সাহাবী জিজ্ঞাসা করেন, 'পুরুষেরা শাহাদত বরণ করতে পারেন এবং তারা যুদ্ধ-বিগ্রহে অংশ নেন এবং বড় বড় কুরবানী করেন। কিন্তু, আমরা নারীরা যারা ঘরে অবস্থান করে থাকি, আমাদের অবস্থান বা পদমর্যাদা কী রকম?' মহানবী (সা.) জবাব দেন, 'যখন তোমরা তোমাদের ঘরের দেখাশোনা করো এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততির লালন-পালন ও পরবর্তী প্রজন্মের শিক্ষাপ্রশিক্ষণ দিয়ে থাক এবং ঘরের সুরক্ষা বিধান করে থাক, তখন তোমরা পুরুষদের মতোই প্রতিদান ও পুরস্কার পাবে'।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরও বলেন: "নিজেদের ঘরের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পরিবেশ সুনিশ্চিত (নিরাপদ) করা এবং একটি ধর্ম-পরায়ণ জীবনযাপনের মাধ্যমে নারীরা সত্যিকারের এক মহান আধ্যাত্মিক পদমর্যাদা লাভ করতে পারেন। সর্বোপরি, তারা হলেন নবীগণের মাতা। নিঃসন্দেহে, মহানবী (সা.) বলেছেন যে, 'জান্নাত মায়েদের পায়ের তলায় অবস্থিত'। আর তাই, একজন নারীর মর্যাদা এমন যে, যদি তারা তাদের সন্তানদেরকে ধার্মিকতার সাথে (পবিত্রতার সাথে) লালন-পালন করেন, তাহলে তারা (সন্তানগণ) জান্নাতের দরজাকে খুলে দেওয়ার মাধ্যম হিসেবে প্রমাণিত হবে। এর চেয়ে মহৎ বিষয় আর কী হতে পারে? মনে রাখবেন, মহানবী (সা.) এটি বলেন নি যে, 'জান্নাত কারও পিতার পায়ের তলায় অবস্থিত'। এভাবে ইসলামে একজন মায়ের মর্যাদা সর্বোচ্চ পর্যায়ের এবং এর ফলে নারীর মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চ বটে। এটা এমন একট পদ এবং মর্যাদা, যার সাথে অন্য কেউ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে নাড় যতক্ষণ পর্যন্ত একজন নারী তার ধর্মবিশ্বাসে দৃঢ় থাকেন এবং পরবর্তী প্রজন্মের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ প্রদান নিশ্চিত করেন।"

সভা অংশগ্রহণকারী একজন স্বল্প-বয়স্কা ওয়াক্‌ফে নও জিজ্ঞাসা করে যে, কীভাবে সে অল্প বয়স থেকেই একজন উত্তম ওয়াক্‌ফে নও-এ পরিণত হতে পারে।

হুযূর আকদাস তাকে উপদেশ প্রদান করেন যে, যখন সে সাত বছর বয়সে পৌঁছাবে তখন তার দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিয়মিত আদায় করা শুরু করা উচিত এবং পবিত্র কুরআন পাঠ শিখা এবং প্রতিদিন তা পাঠ করা উচিত।

উপরন্তু, হুযূর আকদাস বলেন যে, শিশুদের তাদের পিতামাতার কথা শোনা উচিত এবং ওয়াক্‌ফে নও স্কিমের সদস্যদের তাদের উন্নত চরিত্রের জন্য সুপরিচিত হওয়া উচিত।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন: "সবসময় মনে রাখবেন যে, আপনি একজন ওয়াক্‌ফে নও। আপনাকে ভাল আচরণ প্রদর্শন করতে হবে এবং সবসময় আপনার সহপাঠী বালিকাদের এবং শিক্ষার্থীদের প্রতি ভদ্র ও দয়ালু হতে হবে এবং আচরণের এরূপ সর্বোচ্চ মান প্রদর্শন করতে হবে, যেন আপনার পরিচিত প্রতিটি ব্যক্তি আপনার উচ্চ স্তরের ভদ্রতা এবং উন্নত চরিত্রের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করে। তখন আপনি তাদেরকে বলতে পারবেন যে, 'আমি ওয়াক্‌ফে নও বিধায় আমি ভাল আচরণ করি এবং ভাল কাজ করতে চাই।"

একজন ওয়াক্‌ফে নও সদস্যা জিজ্ঞাসা করেন যে, কীভাবে একজন ব্যক্তি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র প্রতি সর্বোত্তমভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারেন।

এর উত্তরে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন: "যখন আপনারা বলেন, 'আলহামদুলিল্লাহ' ('সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই'), তখন তিনি আপনাদেরকে যেসব অনুগ্রহ দান করেছেন সেগুলো হৃদয়ে ধারণ করেই তা বলা উচিত। আর এটাই হচ্ছে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার সবচেয়ে ভাল উপায়। এমনকি যদি কোনো ব্যক্তিকে কিছু পরীক্ষা ও কষ্টের সম্মুখীনও হতে হয়, তাহলেও তাদের ধৈর্য ধারণ করার সাথে সাথে এটি মনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ্ তাদের প্রতি কত অসংখ্য অনুগ্রহ ও আশিস বর্ষণ করেছেন। এসব অনুগ্রহই সর্বদা অন্তরে ধারণ করা উচিত আর কখনই ভুলে যাওয়া উচিত নয়।"

হুযূর আকদাস এ প্রসঙ্গে এক বাদশাহ্ ও তার সভাষদের কাহিনী বর্ণনা করেন। বাদশাহ্ তার সভাসদকে একটি ফল প্রদান করেন যা খুবই তিক্ত স্বাদের ছিল। কিন্তু সেই সভাসদ ফলটি খেয়ে এর ভূয়সী প্রশংসা করলেন ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। বাদশাহ্ যখন বুঝতে পারলেন যে, ফলটি তিক্ত ছিল, তখন তিনি তার সভাসদকে এর প্রশংসা করার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। এর উত্তরে সভাসদ বলেন যে, বাদশাহ্‌র কাছ থেকে প্রাপ্ত অতীতের সমস্ত অনুগ্রহের কথা ভুলে গিয়ে এটা মুখ থেকে ফেলে দেওয়া এবং এ সম্পর্কে অভিযোগ করা, তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞতার প্রকাশ হয়ে যেত, আর তাই এমন করাটা তার শোভা পায় না।

হুযূর আকদাস এই প্রসঙ্গে মহানবী (সা.)-এর একটি হাদীস বর্ণনা করেন যে, পার্থিব ক্ষেত্রে কারো সর্বদা নিজের চেয়ে কম সৌভাগ্যবানদের দিকে দৃষ্টিপাত করা উচিত আর এভাবে আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা যে অনুগ্রহরাজি বর্ষণ করেছেন তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি। তবে, ঈমান ও আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে, কারো তার চেয়ে উচ্চতর পদমর্যাদার ব্যক্তিদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা উচিত, আর তাদের সম-মর্যাদায় উপনীত হওয়ার এবং তাদেরকে ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত। হুযূর আকদাস এটিকেই

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-8 Thursday, 14 Dec, 2023 Issue No.50

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

আল্লাহ্‌র প্রতি সত্যিকারভাবে কৃতজ্ঞ হওয়ার উপায় হিসেবে বর্ণনা করেন।

হুযূর আকদাসকে প্রশ্ন করা হয় যে, সাধারণ পড়াশোনার ক্ষেত্রে তিনি কী রকম শিক্ষার্থী এবং বড় হয়ে তিনি কী হতে চেয়েছিলেন। বর্তমানে যারা পড়াশোনায় রত আছে, তাদের প্রতি হুযূরের কোনো দিক-নির্দেশনা আছে কিনা সেটাও জিজ্ঞাসা করা হয়। হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন: "আমি সেরা শিক্ষার্থী ছিলাম না। তবে, আপনাদের সবার উচিত পড়াশোনার ক্ষেত্রে অন্যদের চেয়ে ভাল করার জন্য চেষ্টা করা। আজকাল পড়াশোনা ব্যতীত বেঁচে থাকাই কঠিন এবং যেহেতু আপনারা জীবন-উৎসর্গকারী ওয়াক্‌ফে নও, তাই আপনাদের আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের জন্য সম্পদে পরিণত হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। অতএব, অধ্যয়ন এবং জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে উন্নতি ও উৎকর্ষ অর্জনের চেষ্টা করুন, যেন আপনি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জীবনকে উন্নত করার পাশাপাশি তাদেরকে পথ-প্রদর্শন ও সুরক্ষা দান করতে পারেন।"হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরও বলেন: "আমি যখন ছোট ছিলাম, তখন আমার অনেক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল এবং কখনও কখনও আমি ভাবতাম যে, বড় হয়ে আমি এ রকম কিছু হবো, আবার অন্য সময়ে ভিন্ন কিছু হতে চাইতাম। অবশেষে, যেহেতু কৃষির প্রতি আমার আগ্রহ ছিল তাই আমি এই বিষয়ে একটি ডিগ্রি অর্জন করেছিলাম এবং এরপর আমি আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের জন্য জীবন উৎসর্গ করি, আর আল্লাহ্‌ আমাকে এর জন্য সুযোগ করে দিয়েছেন। যাহোক, জীবন উৎসর্গ করার আমার এই আকাঙ্ক্ষা আমার শৈশব থেকেই ছিল এবং আল্লাহ্‌র অপার কৃপায় আমি তা পূরণ করতে সক্ষম হয়েছিলাম।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরও বলেন: "আমার আরও অনেক ইচ্ছা ছিল যার মাধ্যমে আমি ভেবেছিলাম যে, আমি এক বা একাধিক কিছু হতে পারবো এবং তারপর আমি আমার জীবন উৎসর্গ করবো। আমি এগুলোর কোনোটাই হতে পারতাম না; কিন্তু আল্লাহ্‌ আমাকে জীবন উৎসর্গ করার সুযোগ দেন এবং অবশেষে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ আমাকে এই অবস্থানে উপনীত করেন। যাহোক, আপনাদের সবার জন্য আমার দিক-নির্দেশনা হচ্ছে, যেহেতু আপনারা জীবন উৎসর্গ করেছেন, সেজন্য আপনাদেরকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে এবং অধ্যবসায়ের সাথে পড়াশোনায় উচ্চমান অর্জনের জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

এমনকি পরবর্তীতে যদি আপনি চাকুরিতে যোগদান না-ও করেন, তথাপি আপনি আপনার অর্জিত এই শিক্ষা থেকে উপকৃত হবেন এবং পরবর্তী প্রজন্মের কল্যাণের জন্য তা সহায়কও হবে।"

একজন মা তার ছোট শিশুকে লালনপালনের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হওয়ার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, একটি ছোট শিশুর [দেখাশোনার] কারণে তিনি প্রায়ই ক্লান্ত ও নিঃশেষিত বোধ করেন। এ বিষয়ে হুযূর আকদাসের নিকট তিনি দিক-নির্দেশনা চান।

এর উত্তরে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন: "এমনকি এ বিষয়টি যদি আপনার কাছে কঠিন বলেও প্রতীয়মান হয়, তবুও আপনার সন্তানের প্রতি রাগ দেখানো আপনার উচিত হবে না, কিংবা আপনার হতাশার বহিঃপ্রকাশ তার ওপর করবেন না। বরং, আপনার সন্তানকে বোঝানো উচিত যে, আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন এবং বিশ্রাম নিতে যাচ্ছেন এবং তাকে পুনরায় আশ্বস্ত করবেন যে, আপনি পরবর্তীতে তার সঙ্গে খেলা করবেন। শিশুরা স্বভাবতই বুদ্ধিমান হয়ে থাকে এবং তারা বুঝতেও পারে। আপনি এমনকি তাকে আপনার ক্লান্তির কথা বলতে পারেন এবং সে তখন তখন আপনার পা টিপে দিতে পারে কিংবা মাথা মালিশ করে দিতে পারে এবং শিশুটি এ কাজগুলো উপভোগও করতে পারে। এভাবেই আপনি তাদেরকে তালিম ও তরবিয়ত [শিক্ষা-প্রশিক্ষণ] প্রদান করতে পারেন। তবে, রাগ দেখাবেন না, চিৎকার-চেঁচামেচি করবেন না এবং তাদের প্রতি নেতিবাচক কোনোকিছু বলবেন না।"

এই প্রশ্নকারী মা আরও জানতে চান যে, সর্বোত্তম উপায়ে তার আবেগ-অনুভূতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তিনি কোন দোয়া পাঠ করবেন। এ বিষয়ে হুযূর আকদাস বলেন, তার উচিত দরূদ শরীফ– মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি আশিস, রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হওয়ার জন্য দোয়া, পাঠ করা।

আরেকটি প্রশ্নে হযরত আকদাসের কাছে জানতে চাওয়া হয় যে, তাঁর খেলাফতকালে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত যে প্রতিকূল পরিস্থিতি এবং তীব্র বিরোধিতা ও যুলুম-নির্যাতনের সম্মুখীন হচ্ছে, সে সময়টিতে আল্লাহ্‌ তা'লা, যিনি আবেগ-অনুভূতির ক্ষেত্রে সহায়তা লাভের উৎস, তিনি ছাড়া আর কেউ কি ছিলেন যার প্রতি হুযূর নির্ভর করেছিলেন?

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ বলেন: "সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কেউই নেই। একমাত্র আল্লাহ্‌ই আমাকে সাহায্য করে থাকেন এবং তিনি ব্যতীত আর কেউই আমাকে সাহায্য করার শক্তি রাখে না।"

সভার শেষে, ইসলামের খাতিরে জীবনউৎসর্গকারী ওয়াক্‌ফে নও সদস্যগণ যেন তাদের অঙ্গীকার পূরণ করতে পারে, সে বিষয়ে দোয়া করেন হুযূর আকদাস।হযরত মির্যা মসরূর আহমদ বলেন:

"সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ আপনাদেরকে সুরক্ষা করুন, নিরাপদে রাখুন। ওয়াক্‌ফে নও স্কিমের নারী সদস্যা হিসেবে যে প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ধর্মের খাতিরে আপনার জীবন উৎসর্গ করেছেন, তা যেন পূরণ করতে পারেন এবং সেই সাথে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে যেন সর্বোত্তম উপায়ে সুরক্ষা ও লালন-পালন করতে পারেন। একটি ধার্মিক আহমদী মুসলিম প্রজন্ম যেন আপনাদের মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করে আর বেড়ে উঠে এবং তারা যেন বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রচারকে ছড়িয়ে দিতে পারে। আমি এটাও দোয়া করি, যেন আপনারা শীঘ্রই দেশের ধর্মান্ধ মোল্লাদের অশুভ চক্র থেকে মুক্তি পান এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ যেন সবসময় আপনাদের সাহায্যকারী ও অভিভাবক হন।"

কোনও মসীহ ও মাহদীর দাবিদার নেই। ঈসা (আ.) আকাশ থেকে নেমে আসেন নি। কেবল একজনই দাবিদার রয়েছে। ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে আর আল্লাহ্‌ তা'লা পূর্ণ করছেন। এই বিষয়গুলিই আমাদেরকে বাধ্য করছে প্রতিশ্রুত মসীহর দাবিকে মেনে নিতে যিনি এসে গিয়েছেন। আর তিনিই প্রকৃত দাবিদার। আঁ হযরত (সা.) আমাদের জন্য একথাও বলেছিলেন যে, প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী চতুর্দশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হবেন। এখন তো চতুর্দশ শতাব্দীও অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। কেবল একজনই দাবিদার আছে। আর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, তাঁর জামাত প্রতিনিয়ত উন্নতি করে চলেছে, যা থেকে প্রমাণ হয় যে, তিনিই প্রকৃত সত্তা আর এখন তো সময়ও অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এখন আর কোন ব্যক্তি আসবে না। তাই আপনি এখন তাদের সঙ্গে বিতর্ক করতে পারেন, কিন্তু যারা কঠোর প্রকৃতির, তারা কোন কথা মানতে চায় না, ভীষণ একগুঁয়ে হয়ে থাকে। আপনি তাদেরকে জোর করে বিশ্বাস করাতে পারবেন না। কিন্তু আমাদের সপক্ষে বহু সাক্ষী-প্রমাণ রয়েছে। আপনি জামাতের বই-পুস্তক পড়তে পারেন, সেখানে আরও অনেক যুক্তি-প্রমাণ দেখতে পাবেন। স্বর্গীয় নিদর্শনের পাশাপাশি জাগতিক নিদর্শনও রয়েছে, যেগুলির মধ্যে অনেকগুলি পূর্ণ হয়ে গিয়েছে।

প্রশ্ন: নাইজেরিয়ায় সাইবার অপরাধ যুবকদের মাঝে ব্যাপক প্রভাব ফেলছে। (এ প্রসঙ্গে হুযূরের দিকনির্দেশনা চাইছি)

হুযূর আনোয়ার বলেন, যুবকরা যখন অনেক বেশি অন-লাইন গেমে ব্যস্ত থাকবে তখন তা তাদেরকে সেই অন্ধকার পথে ঠেলে দিবে,এটিই অন-লাইন ক্রামের পথ।

আমি দীর্ঘদিন থেকে একথা বলে আসছি যে, আপনারা অন-লাইন গেমিং এ আসক্ত হবেন না। এটা আপনাদের বিপথে চালিত করবে। যারা এই ধরণের অন-লাইন গেম তৈরী করছে আসলে তারা মানুষের জীবনের ধ্বংস করছে। এরফলে যুবকরা অন-লাইন গেমিং এ আসক্ত হয়ে পড়ছে। সময়ের সাথে তারা আরও অন্যান্য খারাপ কাজেও লিপ্ত হয়ে পড়ে। তাই আহমদী মুসলমানদের সেই সব জিনিস থেকে দূরে থাকা উচিত যা তাদেরকে সাইবার অপরাধের মত বিষয়ের দিকে নিয়ে যেতে পারে। তাই এগুলি থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করা উচিত যাতে নিরাপদ থাকতে পারেন। ইন্টারনেটে কেবল ভাল কিছু দেখার চেষ্টা করুন।

(সৌজন্যে: আল ফযল ইন্টারন্যাশন্যাল, ২৫শে জানুয়ারী, ২০২২)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir